নজরুল ইসলাম

"**ব্যথার দান** গদ্যে লিখিত গল্প-পুস্তক হইলেও সাধারণ গল্প-পুস্তক হইতে ইহার প্রভেদ আছে। ভাষার সচ্ছন্দ গতি, বর্ণনা-চাতুর্য্য, কল্পনার বর্ণ-মাধুরী সমস্ত বইখানির চারিদিকে কবিত্বের স্বপ্নজাল বুনিয়া দিয়াছে। যে-হিসাবে '**উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম**' ও '**বসন্ত-প্রয়াণ**' বাংলা-সাহিত্যে গদ্যকাব্য, সেই-হিসাবে '**ব্যথার দান**'কেও **গদ্যকাব্য** বলা যাইতে পারে।

"কবির ভাষার অপূর্ব্বতা, গভীর আত্মবিশ্লেষণ-শক্তি ও রচনার মাধুরী অবলীলাক্রমে আমাদের মনকে শেষ পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যায়। . . . গল্পের স্থান ও নায়কগণের জীবনের ঘটনা-সমাবেশে কবি মৌলিকতা দেখাইয়াছেন। বাংলার শ্যামলতার মাঝে গোলেস্তাঁ, চমন্, বেলুচিস্তানের ডালিমের লালিম-ছোঁওয়া লাগাইয়াছেন। বাঙালীর নিশ্চেষ্ট জীবনের মাঝে 'হিণ্ডেনবার্গ লাইনে' মৃত্যুর মধ্যে মাদকতার আস্বাদ দিয়াছেন।"—**কল্লোল**

মূল্য সাড়ে তিন টাকা

ব্যথার দান

কাজী নজরুল ইস্‌লাম
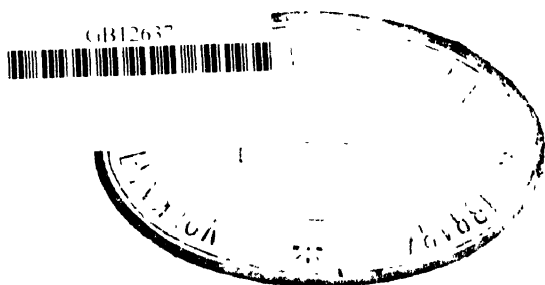
—পরিবেশক—

বাণী লাইব্রেরী
কলেজ ষ্ট্রীট ; কলিকাতা

নওরোজ কিতাবিস্তান
বাংলা বাজার ; ঢাকা

মোহাম্মদ আফজাল্‌-উল হক্
২১, লাউডন ষ্ট্রীট ; কলিকাতা

সপ্তম সংস্করণ
১৯৫৩

মুদ্রাকর—
শ্রীঅবনীমোহন পালচৌধুরী
জাতীয় মুদ্রণ
৭৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট ; কলিকাতা

মানসী আমার।

মাথার কাঁটা নিয়েছিলুম ব'লে

ক্ষমা করনি,

তাই বুকের কাঁটা দিয়ে

প্রায়শ্চিত্ত ক'রলুম।

"বাঙলার কাব্য-জগতে রবীন্দ্র-মানসের প্রাবল্যের যুগেও যিনি আপন স্বকীয়তায় জাতীয় কবির সম্পূর্ণ এক নূতন তেজস্বী ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি কাজী নজরুল ইস্‌লাম। কবি নজরুলকে সেই ভাবেই বাঙলা দেশ চিনে এবং বিশিষ্ট আসন দেয়। **'ব্যথার দান'** অবশ্য কবি-মনের আর এক প্রকাশ। **'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম'** যে-হিসাবে বাঙলা সাহিত্যে একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে এবং যে ভাবে বিদগ্ধজনকে মুগ্ধ করে, **'ব্যথার দান'**-এর রস-আবেদন তাহাই। কবি-মনের এবং শিল্পীর রঙের সমস্ত কমনীয়তা লইয়া বাঙলার সমতল ক্ষেত্রে গোলেস্তাঁ, চমন, বেলুচিস্তানের আখ্‌রোট-ডালিমের বন এক নূতন জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে—অনস্বীকার্য্য। কর্মক্লান্ত জীবনের মাঝখানে অবসর-লালায়িত নিভৃত একটা মন আছে—সেখানে কবির বিরহ-মিলন-কাহিনীর সার্থক আবেদন মুগ্ধতা আনে আর এক কালের, আর এক জগতের।"—**অরণি**

—সূচী—

ব্যথার দান . . . ৩

হেনা ৩৩

বাদল-বরিষণে . . . ৫৭

ঘুমের ঘোরে . . . ৭৫

অতৃপ্ত কামনা . . . ১০৫

রাজ-বন্দীর চিঠি . . ১২৩

ব্যথার দান

'আনন্দ বাজার পত্রিকা' ব'লেন,—

"ব্যথার দান একখানি গল্পকাব্য। তরুণ কবির ব্যথা-ভারাতুর যৌবনের অর্দ্ধনগ্ন স্মৃতির রাগরক্তে অনুরঞ্জিত কাহিনী এই কাব্যের কথা-বস্তু। সমস্ত কাহিনীগুলির উপর মৃত্যুর মসীগাঢ় ছায়া নিদারুণ ভবিতব্যতার মত রহিয়াছে। তাই সেই ছায়ার অবগুণ্ঠনে প্রেম-করুণ হৃদয়ের ব্যথা-ক্রন্দন আপনি করুণ হইয়া উঠিয়াছে।"

* * *

"কোন্ মরমীর মরম-ব্যথা আমার বুকে বেদ্‌না হানে,
জানি গো সেও জানেই জানে।
আমি কাঁদি তাইতে যে তার ডাগর চোখে অশ্রু আনে,
বুঝেছি তা প্রাণের টানে॥

বাইরে বাঁধি মনকে যত
ততই বাড়ে মর্ম্ম-ক্ষত,
মোর সে ক্ষত ব্যথার মত
বাজে গিয়ে তারও প্রাণে,
কে ক'য়ে যায় হিয়ার কানে।"

—ছায়ানট—

* * *

রচনারত কবি

—বাণীর দান—

ব্যথার দান

দারার কথা

গোলেস্তান

গোলেস্তান! অনেক দিন পরে তোমার বুকে ফিরে এসেছি! আঃ মাটীর মা আমার, কত ঠাণ্ডা তোমার কোল! আজ শূন্য আঙিনায় দাঁড়িয়ে প্রথমেই আমার মনে প'ড়ছে জননীর সেই স্নেহ-বিজড়িত চুম্বন আর অফুরন্ত অমূলক আশঙ্কা, আমায় নিয়ে তাঁর সেই ক্ষুধিত স্নেহের ব্যাকুল বেদনা: . . . সেই ঘুম-পাড়ানোর সরল ছড়া,—

"ঘুম-পাড়ানো মাসী-পিসী ঘুম দিয়ে যেয়ো,
বাটা ভ'রে পান দেবো গাল ভ'রে খেয়ো!"

আরও মনে প'ড়্ছে আমাদের মা-ছেলের শত অকারণ আদর-আব্দার! . . . সে মা আজ কোথায়?

দু'-এক দিন ভাবি, হয়তো মায়ের এই অন্ধ স্নেহটাই আমাকে আমার এই বড়-মা দেশটাকে চিন্‌তে দেয়নি। বেহেশ্‌ত্‌ থেকে আব্‌দেরে ছেলের কান্না মা শুন্‌তে পাচ্ছেন কি না জানি নে, কিন্তু এ আমি নিশ্চয় ক'রে ব'ল্‌তে পারি, যে, মাকে হারিয়েছি ব'লেই—মাতৃ-স্নেহের ঐ মস্ত শিকলটা আপ্‌না হ'তে ছিঁড়ে গিয়েছে ব'লেই আজ মা'র চেয়েও মহীয়সী আমার জন্মভূমিকে চিন্‌তে পেরেছি। তবে এও আমাকে স্বীকার ক'রতে হবে,—মা'কে আগে আমার প্রাণ-ভরা শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালবাসা অন্তরের অন্তর থেকে দিয়েই আজ মা'র চেয়েও বড় জন্মভূমিকে ভালবাসতে শিখেছি। মা'কে আমি ছোট ক'রছি নে। ধ'রতে গেলে মা-ই বড়। ভালবাসতে শিখিয়েছেন তো মা। আমার প্রাণে স্নেহের সুরধুনী বইয়েছেন তো মা। আমাকে কাজে অকাজে এমন ক'রে সাড়া দিতে শিখিয়েছেন যে মা! মা পথ দেখিয়েছেন, আর আমি চ'লেছি সেই পথ ধ'রে। লোকে ভাবছে, কি খামখেয়ালী পাগল আমি! কি কাঁটা-ভরা ধ্বংসের পথে চ'লেছি আমি! কিন্তু আমার চলার খবর মা জান্‌তেন, আজ সে-কথা শুধু আমি জানি।

আমায় লোকে ঘৃণা ক'রছে? আহা, আমি ঐ তো চাই। তবে একটা দিন আস্‌বেই যে-দিন লোকে আমার সঠিক খবর জানতে পেরে দু'-ফোটা সমবেদনার অশ্রু ফেল্‌বেই ফেল্‌বে। কিন্তু আমি হয়তো তা' আর দেখতে পাব না। আর তা'

দেখে অভিমানী স্নেহ-বঞ্চিতের মত আমার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না আসবে না। সে দিন হয়তো আমি থাক্‌ব দুঃখ-কান্নার সুদূর পারে।

চমন্‌

আচ্ছা মা! তুমি তো ম'রে শান্তি পেয়েছ, কিন্তু এ কি অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে গেলে আমার প্রাণে? আমি চির-দিনই ব'লেছি, না—না—না, আমি এ-পাপের বোঝা বইতে পার্‌ব না, কিন্তু তা তুমি শুনলে কই? সে কথা শুধু হেসেই উড়িয়ে দিলে, যেন আমার মনের কথা সব জান আর কি? . . . এই যে বেদৌরাকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে গেলে, এর জন্যে দায়ী কে? এখন যে আমার সকল কাজেই বাধা! কোথাও পালিয়েও টিঁক্‌তে পার্‌ছি নে! . . . আমি আজ বুঝতে পার্‌ছি মা, যে, আমার এই ঘর-ছাড়া উদাস মনটার স্থিতির জন্যেই তোমার চির-বিদায়ের দিনে এই পুষ্প-শিকলটা নিজের হাতে আমায় পরিয়ে গিয়েছ। ঐ মালাই তো হ'য়েছে আমার জ্বালা! লোহার শিকল ছিন্ন ক'র্‌বার ক্ষমতা আমার আছে, কিন্তু ফুলের শিকল দ'লে যাবার মত নির্ম্মম শক্তি তো নেই আমার! . . . যা কঠোর, তার ওপর কঠোরতা সহজেই আসে, কিন্তু যা কোমল পেলব নমনীয়, তাকে আঘাত ক'রবে কে? তারই আঘাত যে আর সইতে পারছি নে!

হতভাগিনী বেদৌরা! সে কথা কি মনে পড়ে—সেই

মায়ের শেষ দিন ?—সেই নিদারুণ দিনটা ? মায়ের শিয়রে মরণের দূত ম্লান মুখে অপেক্ষা ক'রছে,—বেদনাপ্লুত তাঁর মুখে একটা নির্ব্বিকার তৃপ্তির আবছায়া ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে,—জীবনের শেষ রুধিরটুকু অশ্রু হ'য়ে তোমার আর আমার মঙ্গলেচ্ছায় আমাদেরই আনত শিরে চুঁইয়ে প'ড়্ছে,—মা'র পূত-সে-শেষের-অশ্রু বেদনায় যেমন উত্তপ্ত, শান্ত স্নেহ-ভরা আশিসে তেমনই স্নিগ্ধ-শীতল! তোমার অযতনে-থোওয়া কালো কোঁকড়ান কেশের রাশ আমাকে শুদ্ধ ঝেঁপে দিয়েছে, আর তার অনেকগুলো আমাদেরই অশ্রু-জলে সিক্ত হ'য়ে আমার হাতে গলায় জড়িয়ে গিয়েছে,—আমার হাতের ওপর কচি পাতার মত তোমার কোমল হাত দু'টী থুয়ে মা অশ্রু-জড়িত কণ্ঠে আদেশ ক'র্ছেন, —"দারা, প্রতিজ্ঞা কর্,—বেদৌরাকে কখনো ছাড়্বি নে।"

তার পর তাঁর শেষের কথাগুলো আরও জড়িয়ে ভারী হ'য়ে এল,—"এর আর কেউ নেই যে বাপ, এই অনাথা মেয়েটাকে যে আমিই এত আদুরে আর অভিমানী ক'রে ফেলেছি!"

সে কি ব্যথিত-ব্যাকুল আদেশ, গভীর স্নেহের সে কি নিশ্চিন্ত নির্ভরতা!

তার পরে মনে পড়ে বেদৌরা, আমাদের সেই কিশোর মর্ম্মতলে একটু একটু ক'রে ভালবাসার গভীর দাগ, গাঢ় অরুণিমা! . . . মুখো-মুখী ব'সে থেকেও হৃদয়ের সেই আকুল কান্না, মনে পড়ে কি সে-সব বেদৌরা? তখন আপনি মনে হ'ত, এই পাওয়ার ব্যথাটাই হ'চ্ছে সব চেয়ে অরুন্তুদ!

তা' না হ'লে সাঁঝের মৌন আকাশ-তলে দু'-জনে যখন গোলেস্তানের আঙুর-বাগিচায় গিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে ব'সতাম, তখন কেন আমাদের মুখের হাসি এক নিমিষে শুকিয়ে গিয়ে দুইটী প্রাণ গভীর পবিত্র নীরবতায় ভ'রে উঠ্‌তো? তখনও কেন অবুঝ বেদনায় আমাদের বুক মুহুর্মুহু কেঁপে উঠ্‌তো? আঁখির পাতায় পাতায় অশ্রু-শীকর ঘনিয়ে আস্‌তো? . . .

আজ সেটা খুব বেশী ক'রেই বুঝতে পেরেছি বেদৌরা! কেননা এই যে জীবনের অনেকগুলো দিন তোমার বিরহে কেটে গেল, তাতে তোমাকে না হারিয়ে আরও বড় ক'রে পেয়েছি। তোমায় যে আমি হারিয়েছিলাম, সে তোমাকে এত সহজে পেয়েছিলাম ব'লেই। বিরহের ব্যথায় জানটা যখন 'পিয়া পিয়া' ব'লে 'ফরিয়াদ্‌' ক'রে মরে, তখনকার আনন্দটা এত তীব্র, যে, তা একমাত্র বিরহীর বুকই বোঝে, তা প্রকাশ ক'রতে আর কেউ কখ্‌খনো পারবে না। দুনিয়ায় যত রকম আনন্দ আছে, তার মধ্যে এই বিচ্ছেদের ব্যথাটাই হ'চ্ছে সব চেয়ে বেশী আনন্দময়!

আর সেই দিনের কথাটা? সে-দিন বাস্তবিকই সেটা বড় আঘাতের মতই প্রাণে বেজেছিল! আমার আজও মনে প'ড়ছে, সে-দিন ফাগুন আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে আকাশে বাতাসে ফলে ফুলে পাতায়! . . . আর সব চেয়ে বেশী ক'রে তরুণ-তরুণীদের বুকে!

আঙুরের ডাঁশা থোকাগুলো রসে আর লাবণ্যে টল্‌-টল্‌ ক'রছে পরীস্তানের নিটোল-স্বাস্থ্য ষোড়শী বাদ্‌শাজাদীদের মত! নাশপাতি-গুলো রাঙিয়ে উঠেছে সুন্দরীদের শরম-রঞ্জিত হিঙুল গালের মত! রস-প্রাচুর্য্যের প্রভাবে ডালিমের দানাগুলো

ফেঁটে ফেটে বেরিয়েছে কিশোরীদের অভিমানে-স্ফুরিত টুক্‌টুকে অরুণ অধরের মত! পেস্তার পুষ্পিত ক্ষেতে বুল্‌বুল্‌দের নওরোজের মেলা ব'সেছে। আড়ালে আগ্‌ডালে ব'সে কোয়েল আর দোয়েল-বধূর গলা-সাধার ধূম প'ড়ে গিয়েছে, কি ক'রে তারা, ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে তাদের তরুণ স্বামীদের মশ্‌গুল ক'রে রাখ্‌বে!. . . উদ্দাম দখিন হাওয়ার সাথে ভেসে-আসা একরাশ খোশ্‌-বু'র মাদকতায় আর নেশায় আমার বুকে তুমি ঢ'লে প'ড়েছিলে। 'শিরাজ্‌-বুল্‌বুল্‌-'এর 'দিওয়ান' পাশে থুয়ে আমি তোমার অবাধ্য দুষ্ট এলো চুলগুলি সংযত ক'রে দিচ্ছিলাম, আর আমাদের দু'-জনারই চোখ ছেপে অশ্রু ব'য়েই চ'লেছিল!

মিলনের মধুর অতৃপ্তি এই রকমে বড় সুন্দর হ'য়েই আমাদের জীবনের প্রথম অধ্যায়ের পাতাগুলো উল্টে দিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় সব ওলট-পালট হ'য়ে গেল, ঠিক যেমন বিরাট্ বিপুল এক ঝঞ্ঝার অত্যাচারে একটা খোলা বই-এর পাতা বিশৃঙ্খল হ'য়ে যায়! . . . সে এলো-মেলো পাতা-গুলো আবার গুছিয়ে নিতে কি বেগই না পেতে হ'য়েছে আমায় বেদৌরা! . . . তা' হোক্, তবু তো এই 'চমনে' এসে তোমায় ফের পেয়েছি। তুমি যে আমারই। বাঙালী কবির গানের একটা চরণ মনে প'ড়ছে,—

"তুমি আমারি যে তুমি আমারি,
মম বিজন-জীবন-বিহারী!"

তার পর সেই ছাড়াছাড়ির ক্ষণটা বেদৌরা, তা' কি মনে প'ড়ছে? আমি শীরাজের বুল্‌বুলের সেই গানটা আবৃত্তি ক'র্‌ছিলাম,—

"দেখ্‌নু সে-দিন ফুল-বাগিচায় ফাগুন মাসের ঊষায়,
সদ্য-ফোটা পদ্ম ফুলের লুটিয়ে পরাগ-ভূষায়,
কাঁদ্‌চে ভ্রমর আপন মনে অঝোর নয়নে সে,
হঠাৎ আমার প'ড়ল বাধা কুসুম চয়নে যে!
কইনু,—"হাঁ ভাই ভ্রমর! তুমি কাঁদ্‌চ সে কোন্ দুখে
পেয়েও আজি তোমার প্রিয়া কমল-কলি'র বুকে?"
রাঙিয়ে তুলে কমল-বালায় অশ্রু ভরা চুমোয়
ব'ল্‌লে ভ্রমর,—"ওগো কবি, এই তো কাঁদার সময়!
বাঞ্ছিতারে পেয়েই তো আজ এত দিনের পরে,
ব্যথা-ভরা মিলন-সুখে অঝোর ঝরা ঝরে!"

এমন সময় তোমার মামা এসে তোমায় জোর ক'রে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল; আমার একটা কথাও বিশ্বাস ক'র্‌লে না। শুধু একটা উপেক্ষার হাসি হেসে জানিয়ে দিলে, যে, সে থাক্‌তে আমার মত একটা ঘর-বাড়ী-ছাড়া বয়াটে ছোক্‌রার সঙ্গে বেদৌরার মিলন হ'তেই পারে না। . . .

আমার কান্না দেখে সে ব'ল্‌লে, যে, ইরাণের পাগলা কবিদের 'দিওয়ান' প'ড়ে প'ড়ে আমিও পাগল হ'য়ে গিয়েছি। তোমার মিনতি দেখে সে ব'ল্‌লে, যে, আমি তোমাকে যাদু ক'রেছি।

তার পর অনেক দিন ঘুরে ঘুরে কেটে গেল ঐ ব্যাকুল-গতি ঝর্ণাটার ধারে। যখন চেতন হ'ল, তখনও বসন্ত-উৎসব তেম্‌নি চ'লেছে, শুধু তুমিই নেই! দেখ্‌লুম ক্রমেই তোমার আলতা-ছোবানো পায়ের পাতার পাতলা দাগগুলি নির্ঝরের কূলে কূলে

মিশিয়ে আস্‌ছে, আর রেশমী চুড়ির ভাঙা টুক্‌রোগুলো বালি-ঢাকা প'ড়ছে!

আমি কখনো মনের ভুলে এ-পারে দাঁড়িয়ে ডাকৃতুম,—বেদৌরা। . . . অনেক ক্ষণ পরে পাথরের পাহাড়টা ডিঙিয়ে ও-পার হ'তে কার একটা কান্না আসতে আসতে মাঝ পথেই মিশিয়ে যেত,—"রা—আঃ—আঃ!"

সারা বেলুচিস্থান আর আফগানিস্থানের পাহাড় জঙ্গল-গুলোকে খুঁজে পেলুম, কিন্তু তোমার ঝর্ণা-পারের কুটীরটীর খোঁজ পেলুম না।

এক দিন সকালে দেখ্‌লুম, খুব উন্মুক্ত একটা ময়দানে একা এক জন পাগলা আস্‌মান-মুখো হ'য়ে শুধু লাফ মার্‌ছে, আর সেই সঙ্গে হাত দু'টো মুঠো ক'রে কিছু ধ'রবার চেষ্টা ক'রছে। আমার বড্ডো হাসি পেল; শেষে ব'ল্‌লুম,—"হাঁ ভাই উৎরিঙ্গে! তুমি কি তিড়িং তিড়িং ক'রে লাফিয়ে আকাশ-ফড়িং ধ'রছ?"

সে আরও লাফাতে লাফাতে সুর ক'রে ব'ল্‌তে লাগল,—

"এ-পার থেকে মারলাম ছুরি লাগ্‌ল কলা গাছে,
হাঁটু বেয়ে রক্ত পড়ে চোখ গেল রে বাবা!"

এতে যে মরা মানুষেরও হাসি পায়! অত দুঃখেও আমি হো-হো ক'রে হেসে ব'ল্‌লুম,—"তুমি কি কবি?"

সে খুব খুশী হ'য়ে চুল দুলিয়ে ব'ল্‌লে,—"হাঁ হাঁ, তাই!"

আমি ব'ল্‌লুম,—"তা তোমার কবিতার মিল হ'ল কই?"

সে ব'ল্‌লে,—"তা নাই বা হ'ল, হাঁটু দিয়ে তোর রক্ত প'ড়ল তো!" এই ব'লেই সে আমার নবোদ্ভিন্ন শ্মশ্রুমণ্ডিত

গালে চুম্বনের চোটে আমায় বিব্রত ক'রে তুলে ব'ললে,—"অনিলের নীল রংটাকে সুনীল আকাশ ভেবে ধ'র্‌তে গেলে সে দূরে স'রে গিয়ে বলে,—"ওগো, আমি আকাশ নই, আমি বাতাস—আমি শূন্য, আমায় ধরা যায় না। আমায় তোমরা পেয়েছ। তবুও যে পাই নি ব'লে ধ'রতে আস, সেটা তোমার জবর ভুল।"

এক নিমেষে আমার মুখের মুখর হাসি মূক হ'য়ে মিলিয়ে গেল! ভাবলাম. হাঁ ঠিকই তো! যাকে ভিতরে, অন্তরের অন্তরে পেয়েছি, তাকে খাম্‌খা বাইরের-পাওয়া পেতে এত বাড়া-বাড়ি কেন? তাই সে দিন আমার পোড়ো-বাড়ীতে শেষ কান্না কেঁদে ব'ল্‌লুম,—"বেদৌরা! তোমায় আমি পেয়েছি আমার হৃদয়ে—আমার বুকের প্রতি রক্ত-কণিকায়!". . .

তার পর এই যে হিন্দুস্থানের অলিতে গলিতে 'কম্‌লি-ওয়ালে' সেজে ফিরে এলুম, সে তো শুধু ঐ এক ব্যথার সান্ত্বনাটা বুকে চেপেই! ভাব্‌তুম এম্‌নি ক'রে ঘুরে ঘুরেই আমার জনম কাট্‌বে, কিন্তু তা আর হ'ল কই? আবার সেই গোলেস্তানে ফিরে এলুম! সেখানে আমার মাটীর কুঁড়ে মাটীতে মিশিয়ে গিয়েছে, কিন্তু তারই আর্দ্র বুকে যে তোমার ঐ পদচিহ্ন আঁকা র'য়েছে, . . . তাই আমায় জানিয়ে দিল, যে, তুমি এখানে আমায় খুঁজতে এসে না পেয়ে শুধু কেঁদে ফিরেছ!

সেই পাগলটা আবার এসে জানিয়ে দিয়ে গেল, যে, তুমি চমনে ফুটে শুকিয়ে যাচ্ছ! . . .

আমি এসেই তোমায় দূর হ'তে দেখে চিনেছি। তবে

তুমি আমায় দেখে অমন ক'রে ছুটে পালালে কেন? সে কি মাতালের মত ট'ল্‌তে ট'ল্‌তে দৌড়ে লুকিয়ে প'ড়্‌লে ঐ খোর্মা গাছগুলোর আড়ালে! সে কি অসম্বৃত অশ্রু ঝ'রে প'ড়ছিল তোমার! আর কতই সে ব্যথিত অনুযোগ ভ'রে উঠেছিল সে করুণ দৃষ্টিতে!

কিন্তু কোথা গেলে তুমি? বেদৌরা, তুমি কোথায়? . . .

বেদৌরার কথা

বোস্তান

মা গো, কি ব্যথিত-পাণ্ডুর আকাশ! এই যে এত বৃষ্টি হ'য়ে গেল, ও অসীম আকাশের কান্না নয় তো?—না, না, এত উদার যে, সে কাঁদ্‌বে কেন? আর কাঁদ্‌লেও তার অশ্রু আমাদের সঙ্কীর্ণ পাপ-পঙ্কিল চোখের জলের মত বিস্বাদ আর উষ্ণ নয় তো! দেখ্‌ছ সে কত ঠাণ্ডা! . . .

কিন্তু আমি কি স্বপ্ন দেখছি? একেবারে এক দৌড়ে চমন থেকে এই বোস্তানে এসেছি! তা' হোক্‌, এতক্ষণে যেন জানটা ধড়ে এল!—আ ম'লো! এত হুঁক্‌রে হুঁক্‌রে বুক ফেটে কান্না আস্‌ছে কিসের? মানুষের মনের মত আর বালাই

নেই! ঐ জ্বালাতেই তো আমায় জ্বালিয়ে খেলে গো।—কি? তার দেখা পেয়েছি ব'লে এ কান্না?—তাতে আর হ'য়েছে কি?

সে যে ফিরে আস্‌বেই, তা তো জানা কথা! কিন্তু এত দিনে কেন? এ অসময়ে কেন? এখন যে আমার মালতীর লতা রিক্তকুসুম! ওগো, এ মরণের তটে এ দুর্দ্দিনে কি দিয়ে বাসর সাজাব? যদি এলেই, তবে কেন দু'-দিন আগেই এলে না? তা হ'লে তো আমায় এমন ক'রে এড়িয়ে চ'ল্‌তে হ'তো না! সেই দিনই—যে দিন আবার ঐ চমনের শুক্‌নো বাগানের ধারে তোমায় দেখ্‌তে পেয়েছিলাম—সেই দিনই তোমার বুকে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে ব'ল্‌তাম,—"এস প্রিয়, ফিরে এস!"

আমরা নারী, একটুতেই যত কেঁদে ভাসিয়ে দিতে পারি, পুরুষরা তা তো পারে না। তাদের বুকে যেন সব সময়েই কিসের পাথর চাপা। তাই যখন অনেক বেদনায় এই সংযমী পুরুষদের দু'টী ফোটা অসম্বরণীয় অশ্রু গড়িয়ে পড়ে, তখন তা' দেখে না কেঁদে থাক্‌তে পারে, এমন নারী তো আমি দেখি না!

সে দিন যখন কত বছর পরে আমাদের চোখোচোখি হ'ল, তখন কত মিনতি-অনুযোগ আর অভিমান মূর্ত্ত হ'য়ে ফুটে উঠে-ছিল আমাদের চারটী চোখেরই সজল চাউনীতে!—হাঁ, আর কেমন 'বেদোরা' ব'লে মাথা ঘুরিয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে সে ঐ খেজুরের কাঁটা-ঝোপটায় প'ড়ে গেল! তা দেখে পাষাণী-আমি কি ক'রেই সে চোখ দু'টো জোর ক'রে দু'-হাত দিয়ে চেপে এত দূর যেন কোন্ অন্ধ অমানুষিক শক্তির বলে ছুটে এলাম?

পুরাণো কত স্মৃতিই আজ আমার বুক ছেপে উঠ্‌ছে! সেই গোলেস্তানে এক জোড়া বুল্‌বুলেরই মত মিলনেই অভিমান,

মিলনেই বিচ্ছেদ-ব্যথা আর তারই প্রগাঢ় আনন্দে অজস্র অশ্রুপাত! তার চিন্তাটাও কত ব্যথিত-বিধুর! তার পর সেই জুয়াচোরের জোর ক'রে আমায় ছিনিয়ে-নেওয়া দয়িতের বুক থেকে,—অনেক কষ্টে তার হাত এড়িয়ে প্রিয়ের অন্বেষণ! —ওঃ, কি-ই না ক'রেছে তাকে আবার পেতে! কই তখনও তো সে এল না!

তার পর ভিতরে বাইরে সে কি দ্বন্দ্ব লেগে গেল! ভিতরে ঐ এক তুষের আগুন ধিকি-ধিকি জ্ব'লতে লাগ্‌ল, আর বাইরে? বাইরে ফাগুনের উদাস বাতাস প্রাণে কামনার তীব্র আগুন জ্বালিয়ে দিলে! ঠিক সেই সময় কোথা থেকে ধূমকেতুর মত সয়ফুল-মুল্‌ক্ এসে আমায় কান-ভাঙানী দিলে—ভালবাসায় কি বিরাট্ শান্ত স্নিগ্ধতা আর করুণ গাম্ভীর্য্য, ঠিক ভৈরবী রাগিণীর কড়ি মধ্যমের মত! আর এই বিশ্রী কামনাটা কত তীব্র—তীক্ষ্ণ—নির্ম্মম! এই বাসনার ভোগে যে সুখ, সে হ'চ্ছে পৈশাচিক সুখ! এতে শুধু দীপক রাগিণীর মত পুড়িয়েই দিয়ে যায় আমাদের! অথচ এই দীপকের আগুন একবার জ্ব'লে উঠ্‌বেই আমাদের জীবনের নব-ফাল্গুনে! সেই সময় স্নিগ্ধ মেঘ-মল্লারের মত সান্ত্বনার একটা-কিছু পাশে না থাক্‌লে সে যে জ্ব'লবেই—দীপক যে তাকে জ্বালাবেই!

তাই তো যে দিন পুষ্পিত যৌবনের ভারে আমি ঢ'লে ঢ'লে প'ড়ছিলাম, আর এক জন এসে আমায় যাচ্ঞা ক'রলে, তখন আমার এই বাহিরের প্রবৃত্তিটা দমন ক'র্‌বার ক্ষমতাই যে রইল না! তখন যে আমি অন্ধ! ওগো দেবতা, সে দিন তুমি কোথায় ছিলে? কেউ যে এল না শাসন ক'রতে তখন!

হায়, সেই দিনই আমার মৃত্যু হ'ল! সেই দিনই আমি ভিখারিণী হ'য়ে পথে ব'সলাম। ওগো আমার সেই অধঃ-পতনের দিনে চোখে যে পুঞ্জীভূত অন্ধকারের নিবিড় কালিমা একেবারে ঘন-জমাট হ'য়ে ব'সেছিল, তখন, এখনকার মত এতটুকুও আলোক যে সে-অন্ধকারটাকে তাড়াতে চেষ্টা করে নি। হয়তো একটী রশ্মিরেখার ঈষৎপাতে সব অন্ধকার সে-দিন ছুটে পালাত! তা হ'লে দেখতে গো, কে আমার সমস্ত হৃদয়-আসন জুড়ে রাজাধিরাজ একচ্ছত্র সম্রাটের মত ব'সে আছে।

তবু যে আমার এ অধঃপতন হ'ল, তা সে দিনও বুঝতে পারি নি, আজও বুঝতে পারছি নে, কেমন যেন সব গোলমাল হ'য়ে যাচ্ছে! কিন্তু আমি যদি বলি, আমার প্রেম—বক্ষের গভীর গোপন-তলে-নিহিত মহান্ প্রেম, যা সর্ব্বদাই পবিত্র, তা তেম্‌নি পূত অনবদ্য আছে আর চিরকালই থাক্‌বে, তার গায়ে আঁচড় কাটে বাইরের কোন অত্যাচার অনাচারের এমন ক্ষমতা নেই,—তা হ'লে কে বুঝবে? কেই বা আমায় ক্ষমা ক'রবে? তবু আমি ব'লব, প্রেম চিরকালই পবিত্র, দুর্জ্জয়, অমর; পাপ চিরকালই কলুষ, দুর্ব্বল আর ক্ষণস্থায়ী।

ওঃ—মা! কি অসহ্য বেদনা এই সারা বুকের পাঁজরে পাঁজরে! . . . কি সব ভুল ব'ক্‌ছিলাম এতক্ষণ? ঠিক যেন খোওয়াব দেখছিলাম, না? . . . পাপ ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু নদীর বান-ভাসির পর যেমন বান রেখে যায় একটা পলির আবরণ সারা নদীটার বুকে, তেম্‌নি পাপ রেখে যায় সঙ্কোচের পুরু একটা পর্দ্দা; সেটা কিন্তু ক্ষণস্থায়ী নয়, সেটা

হয়তো অনেকেরই সারা জীবন ধ'রে থাকে। পাপী নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে হাজার ভাল ক'রে চ'ল্‌লেও ভাবে, আমার এ দুর্নাম তো সারাজীবন কাদা-লেপ্টা হ'য়ে লেগেই থাক্‌বে! চাঁদের কলঙ্ক পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাও যে ঢাক্‌তে পারে না! এই পাপের অনুশোচনাটা কত বিষাক্ত—তীক্ষ্ণ! ঠিক যেন এক সঙ্গে হাজার হাজার ছুঁচ বিঁধ্‌ছে বুকের প্রতি কোমল জায়গায়। . . .

আবার আমার মনে প'ড়্‌ছে সেই আমার বিপথে-টেনে-নেওয়া শয়তান সয়ফুল-মুল্‌কের কথা। সে-ই তো যত 'নষ্ট-গুড়ের খাজা'। এখন তাকে পেলে নখ দিয়ে ছিঁড়ে ফেল্‌তাম!

আমরা নারী,—মনে করি, এতটুকুতেই আমাদের হৃদয় অপবিত্র হ'য়ে গেল, আর অনুশোচনায় মনে মনে পুড়ে মরি। আমরা আরও ভাবি, যে, হয়তো পুরুষদের অত সামান্যতে পাপ স্পর্শে না। আর তাদের মনে এত তীব্র অনুশোচনাও জাগে না। কিন্তু সেই যে সে-দিন, যে-দিন আমার বাসনার পিয়াস শুকিয়ে গিয়েছে, আর মধু ভেবে আকণ্ঠ হলাহল-পানের তীব্র জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ ক'র্‌ছি, আর ঠিক সেই সময় সহসা বিরাট্‌ বিপুল হ'য়ে আমার ভিতরের প্রেমের পবিত্রতা অপ্রতিহত তেজে জেগে উঠেছে—সে তেজ চোখ দিয়ে ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে,—সে দিন—ঠিক সেই দিন—সয়ফুল্‌-মুল্‌ক্‌ সহসা কি রকম ছোট হ'য়ে গেল! একটা দুর্ব্বার ঘৃণামিশ্রিত লজ্জার কালিমা তার মুখটাকে কেমন বিকৃত ক'রে দিলে! সে দূর থেকে কেমন আমার দিকে একটা ভীত-চকিত দৃষ্টি

ফেলে উপর দিকে দু' হাত তুলে আর্তনাদ ক'রে উঠ্‌ল,—"খোদা! আমি জীবন দিয়ে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রব। তবে যেন সে-জীবন মঙ্গলার্থেই দিতে পারি, শুধু এইটুকু ক'রো খোদা!"

তার পর কেমন সে উন্মাদের মত ছুটে এসে আমার পায়ের ওপর হুম্‌ড়ি খেয়ে প'ড়ে ব'ল্‌লে,—"দেবি, ক্ষমা ক'রো এ শয়তানকে! দেবার দেবীত্ব চিরকালই অটুট থাকে, বাইরের কলঙ্কে তা কলঙ্কিত হয় না, বরং সংঘর্ষণের ফলে তা আরও মহান্‌ উজ্জ্বল হ'য়ে যায়! কিন্তু আমি?—আমি? ওঃ, ওঃ, ওঃ!" সে উদ্ধশ্বাসে ছুট্‌ল। তার সে-ছোটা থেমেছে কিনা জানিনে।

কিন্তু এ কি? আবার আমার মনটা কেন আমাকে যেন ভাওানী দিচ্ছে শুধু এক বার দেখে আস্‌তে, যে, তিনি তেম্‌নি ক'রে সেই খেজুর-কাঁটার ঝোপে বেহুঁশ হ'য়ে প'ড়ে আছেন কি না। . . . না, না,—এ প্রাণ-পোড়ানী আর সইতে পারি নে গো—আর সইতে পারিনে! হাঁ, তাঁর সঙ্গে দেখা ক'র্‌বই ক'র্‌ব, একবার শেষ দেখা; তার পর ব'লবো তাঁকে,—ওগো, তোমার সে বেদৌরা আর নেই,—সে ম'রেছে ম'রেছে! তার প্রাণ তোমারই সন্ধানে বেরিয়ে গিয়েছে! তুমি তাকে বৃথা এমন ক'রে খুঁজে বেড়াচ্ছ! বেদৌরা নেই—নেই—নেই!

তার পর—তার পর? তার পরেও যদি তিনি আমায় চান, তা হ'লে কি ব'লব তাঁকে, কি ক'রব তখন?—না, তখনও এমনি শক্ত কাঠ হ'য়ে ব'লব,—ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না গো দেবতা

ছুঁয়ো না! আমার এ অপবিত্র দেহ ছুঁয়ে তোমার পবিত্রতার অবমাননা ক'রো না!

আঃ! মা গো! কি ব্যথা! বুকের ভিতরটা কে যেন ছুরি হেনে খান্‌-খান্‌ ক'রে কেটে দিচ্ছে! . . .

দারার কথা

গোলেস্তান্‌

তুমি কি সেই গোলেস্তান? তবে আজ তুমি এত বিশ্রী কেন? তোমার ফুলে সে সৌন্দর্য্য নেই, শুধু তাতে নরকের নাড়ী-উঠে-আসা পূতিগন্ধ! তোমার আকাশ আর তেমন উদার নয়, কে যেন তাকে পঙ্কিল ঘোলাটে ক'রে দিয়েছে! তোমার মলয় বাতাসে যেন লক্ষ হাজার কাচের টুক্‌রো লুকিয়ে র'য়েছে! তোমার সারা গায়ে যেন বেদনা! . . .

কি ক'রলে বেদৌরা তুমি? বেদৌরা!—নাঃ, এই যে ব্যথা দিলে তুমি,—এই যে প্রাণ-প্রিয়তমের কাছ থেকে পাওয়া নিদারুণ আঘাত, এতেও নিশ্চয়ই খোদার মঙ্গলেচ্ছা নিহিত আছে! আমি কখনই ভুলব না খোদা, যে, তুমি নিশ্চয়ই মহান্‌, আর তোমার-দেওয়া সুখ দুঃখ সব সমান ও মঙ্গলময়! তোমার কাজে অমঙ্গল থাকতে পারে না, আর তুমি ছাড়া

ভবিষ্যতের খবর কেউ জানে না। ব্যথিতের বুকে এই সান্ত্বনা কি শান্তিময়!

আচ্ছা, তবু মন মান্‌ছে কই? কেন ভাবছি এ নিশ্চয়ই আঘাত? তৃষাতুর চাতক যখন "ফটিক জল—ফটিক জল" ক'রে কেঁদে কেঁদে মেঘের কাছে এসে পৌছে, আর নিদারুণ মেঘ তার বুকে বজ্র হেনে দিয়ে বিদ্যুৎ-হাসি হাসে, তখন কেন মনে করি, এ মেঘের বড়ই নিষ্ঠুরতা!—কেন?

কিন্তু এত দিনেও নিজের স্বরূপ জানতে পারলুম না! আগে মনে ক'রতুম, আমি কত বড়—কত উচ্চ! আজ দেখছি, সাধারণ মানুষের চেয়ে আমি এক রত্তিও বড় নই! আমারও মন তাদের মত অম্‌নি সঙ্কীর্ণতা আর নীচতায় ভরা। নৈলে আমি বেদৌরার এ দোষ সরল মনে ক্ষমা ক'রতে পারলুম না কেন? হোক্ না কেন যতই বড় সে দোষ! বাহিরটা তার নষ্ট হ'য়েছে বটে, কিন্তু ভিতরটা যে তেমনি পবিত্র আর শুভ্র র'য়েছে! অনেকে যে ভিতরটা অপবিত্র ক'রে বাহিরটা পবিত্র রাখ্‌বার চেষ্টা করে, সেইটাই হ'চ্চে বড দোষ। কিন্তু এই যে বেদৌরার সহজ সরলতায় তার ভিতরটা পবিত্র র'য়েছে জেনেও তাকে প্রাণ খুলে ক্ষমা ক'রতে পারলুম না, সে দোষ তো আমারই; কেননা আমি এখনও অনেক ছোট। জোর ক'রে বড় হবার জন্যে একবার ক্ষমা ক'রতে ইচ্ছা হ'য়েছিল বটে, কিন্তু তা তো হ'তে পারে না। সে যে হৃদয় হ'তে নয়!—নাঃ, আমাকে পুড়ে খাঁটী হ'তে হবে। খুব দূরে থেকে যদি মনটাকে ঠিক ক'রতে পারি, তবেই আবার ফির্‌ব, নইলে নয়। ওঃ কি নীচ আমি! প্রথমে বেদৌরার মুখ থেকে তার এই পতনের কথা

শুনে আমিও তো একেবারে নরক-কুণ্ডে গিয়ে পৌঁছেছিলুম। মনে ক'রেছিলুম, আমিও এমনি ক'রে আমার সুপ্ত কামনায় ঘৃতাহুতি দিয়ে বেদৌরার ওপর শোধ নেব। তার পর নরকের দ্বার থেকে কেমন ক'রে হাত ধ'রে অশ্রু মুছিয়ে আমায় কে যেন ফিরিয়ে আন্‌লে! সে বেশ শান্ত স্বরেই ব'ললে,—"এ প্রতিশোধ তো বেদৌরার ওপর নয় ভাই, এ প্রতিশোধ তোমার নিজের ওপর।" ভাবলুম, তাই তো অভিমানের ব্যথায় ব্যথিত হ'য়ে এ কি আত্মহত্যা ক'রতে যাচ্ছিলুম! আমি আবার ফিরলুম।

তার পর বেদৌরাকে ব'লে এলুম,—"বেদৌরা! যদি কোন দিন হৃদয় হ'তে ক্ষমা ক'রবার ক্ষমতা হয়, তবেই আবার দেখা হবে, নইলে এই আমার চির-বিদায়! মুখে জোর ক'রে ক্ষমা ক'রলুম ব'লে তোমায় গ্রহণ ক'রে আমি তো একটা মিথ্যাকে বরণ ক'রে নিতে পারিনে। আমি চাই, প্রেমের অঞ্জন আমার এই মনের কালিমা মুছিয়ে দিক্।

বেদৌরা অশ্রু-ভরা হাসি হেসে ব'ললে,—"ফিরতেই হবে প্রিয়তম, ফিরতেই যে হবে তোমার! এ সংশয় দু'-দিনেই কেটে যাবে। তখন দেখবে, আমাদের সেই ভালবাসা কেমন ধৌত শুভ্র বেশে আরও গাঢ় পূত হ'য়ে দেখা দিয়েছে! আমি তোমারই প্রতীক্ষায় গোলেস্তানের এই ক্ষীণ ঝর্‌ণাটার ধারে ব'সে গান আর মালা গাঁথব। আর তা' যে তোমায় প'রতেই হবে! ব্যথার পূজা ব্যর্থ হবার নয় প্রিয়!. . ."

কোথায় যাই এখন, আর সে কোন্ পথে? ওগো আমার পথের চিরসাথি, কোথায় তুমি?

সয়ফুল-মুলুকের কথা

* * *

আমি সেই শয়তান, আমি সেই পাপী, যে এক দেবীকে বিপথে চালিয়েছিল। ভাবলুম, এই ভুবনব্যাপী যুদ্ধে যে-কোনো দিকে যোগ দিয়ে যত শীগ্‌গির পারি এই পাপ-জীবনের অবসান ক'রে দিই। তার পর? তার পর আর কি? যা সব পাপীদের হয়, আমারও হবে।

পাপী যদি সাজা পায়, তা' হ'লে সে এই ব'লে শান্তি পায়, যে, তার ওপর অবিচার করা হ'চ্ছে না, এই শাস্তিই যে তার প্রাপ্য। কিন্তু শাস্তি না পেলে ভিতরের বিবেকের যে দংশন, তা নরক-যন্ত্রণার চেয়ে অনেক বেশী ভয়ানক।

যা ভাবলুম, তা' আর হ'ল কই! ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে শেষে এই মুক্তিসেবক সৈন্যদের দলে যোগ দিলুম। এ পরদেশীকে তাদের দলে আস্‌তে দেখে এই সৈন্যদল খুব উৎফুল্ল হ'য়েছে। এরা মনে ক'রছে, এদের এই মহান্ নিঃস্বার্থ ইচ্ছা বিশ্বের অন্তরে অন্তরে শক্তি সঞ্চয় ক'রছে। আমায় আদর ক'রে এদের দলে নিয়ে এরা বুঝিয়ে দিলে যে কত মহাপ্রাণতা আর পবিত্র নিঃস্বার্থপরতা-প্রণোদিত হ'য়ে তারা উৎপীড়িত বিশ্ববাসীর পক্ষ নিয়ে অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রছে এবং আমিও সেই মহান্

ব্যক্তিসঙ্ঘের এক জন। আমার কালো বুকে অনেকটা তৃপ্তির আলোক পেলুম!

খোদা, আজ আমি বুঝতে পারলুম, পাপীকেও তুমি ঘৃণা কর না, দয়া কর। তার জন্যেও সব পথই খোলা রেখে দিয়েছ। পাপীর জীবনেও দরকার আছে। তা দিয়েও মঙ্গলের সল্‌তে জ্বালানো যায়। সে ঘৃণ্য অস্পৃশ্য নয়!

কিন্তু সহসা এ কি দেখলুম? দারা কোথা থেকে এখানে এল? সে দিন তাকে অনেক ক'রে জিজ্ঞেস করায় সে ব'ললে,—"এর চেয়ে ভাল কাজ আর দুনিয়ায় খুঁজে পেলুম না, তাই এ দলে এসেছি।"

আঘাত খেয়ে খেয়ে কত বিরাট্-গম্ভীর হ'য়ে গিয়েছে সে। আমাকে ক্ষমা চাইতেই হবে যে এই বেদনাতুর যুবকের কাছে; নইলে আমার কোথাও ক্ষমা নেই। এর প্রাণে এই ব্যথার আগুন জ্বালিয়েছি তো আমিই, একে গৃহহীন ক'রেছি তো আমিই।

কি অচিন্ত্য অপূর্ব্ব অসমসাহসিকতা নিয়ে যুদ্ধ ক'রছে দারা। সবাই ভাবছে এত অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রাণের প্রতি ভ্রূক্ষেপও না ক'রে বিশ্ববাসীর মঙ্গলের জন্যে হাসতে হাসতে যে এমন ক'রে বুকের রক্ত দিচ্ছে, সে বাস্তবিকই বীর, আর তাদের জাতিও বীরের জাতি! এমন দিন নেই, যে দিন একটা-না-একটা আঘাত আর চোট খেয়েছে সে। সে দিকে কিন্তু দৃষ্টিই নেই তার। সে যেন অগাধ অসীম এক যুদ্ধ-পিপাসা নিয়ে প্রচণ্ড বেগে মৃত্যুর মত কঠোর হ'য়ে অন্যায়কে আক্রমণ ক'রছে। যতক্ষণ এতটুকুও জ্ঞান থাকে তার, ততক্ষণ কার সাধ্য তাকে যুদ্ধস্থল থেকে ফেরায়! কি একরোখা জেদ! আমি কিন্তু

বুঝতে পারছি, এ সংগ্রাম তার বাইরের জন্যে নয়, এ যে ভিতরের ব্যথার বিরুদ্ধে ব্যর্থ অভিযান। আমি জানি, হয় এর ফল অতি বিষময়, নতুবা খুবই শান্ত সুন্দর!

ক'দিন থেকে বোমা আর উড়ো জাহাজ হ'য়েছে এর সঙ্গী। বাইরে ভিতরে এত আঘাত এত বেদনা অম্লান বদনে সহ্য ক'রে কি ক'রে একাদিক্রমে যুদ্ধ জয় ক'রছে এই উন্মাদ যুবক? ভয়টাকে যেন আরব সাগরে বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছে!

আজ সে এক জন সেনাপতি। কিন্তু এ কি অতৃপ্তি এখনও তার মুখে বুকে জাগছে! রোজই জখম হ'চ্ছে, কিন্তু তাকে হাঁসপাতালে পাঠায় কার সাধ্য? গোলন্দাজ সৈনিককে ঘুমাবার ছুটি দিয়ে ভাঙা-হাতেই সে কামান দাগছে। সেনাপতি হ'লেও সাধারণ সৈনিকের মত তার হাতে গ্রিণেডের আর বোমার থলি, পিঠে তরল আগুনের বাল্‌তি, আর হাতে রিভলভার তো আছেই। রক্ত বইয়ে, লোককে হত্যা ক'রে তার যে কি আনন্দ, সে আর কি ব'লব। সে ব'লছে,—পরাধীন লোক যত কমে, ততই মঙ্গল।

আমি অবাক্ হ'চ্ছি, এ সত্যি-সত্যিই পাগল হ'য়ে যায় নি তো?

* * *

এ কি ক'রলে খোদা! এ কি ক'রলে? এত আঘাতের পরেও হতভাগা দারাকে অন্ধ আর বধির ক'রে দিলে? এই পৈশাচিক যুদ্ধ-তৃষ্ণার ফলে যে এই রকমই একটা কিছু হবে, তা' আমি অনেক আগে থেকেই ভয় ক'রছিলাম! আচ্ছা করুণাময়, তোমার লীলা আমরা বুঝ্‌তে পারি নে বটে, কিন্তু

এই যে নিরপরাধ যুবকের চোখ দু'টো বোমার আগুনে অন্ধ আর কান দু'টো বধির ক'রে দিলে, আর আমার মত পাপী শয়তানের গায়ে এতটুকু আঁচড় লাগ্‌ল না, এতেও কি ব'লব যে, তোমার মঙ্গল-ইচ্ছা লুকানো র'য়েছে? কি সে মঙ্গল, এ অন্ধকে দেখাও প্রভু দেখাও! এ অন্ধের দাঁড়াবার যষ্টিও যে ভেঙে দিয়েছি আমি! তবে কি আমার বাহিরটা অক্ষত রেখে ভিতরটাকে এমনি ছিন্ন-ভিন্ন আর ক্ষত-বিক্ষত ক'রতে থাক্‌বে? ওগো ন্যায়ের কর্ত্তা! এই কি আমার দণ্ড,—এই বিশ্বব্যাপী অশান্তি! . . .

আজ আমাদের ঈপ্সিত এই প্রধান জয়োল্লাসের দিনেও আমাদের জয়-পতাকাটা রাজ-অট্টালিকার শিরে থর থর ক'রে কাঁপছে! বিজয়-ভেরীতে জয়নাদের পরিবর্ত্তে যেন জান্-মোচ্-ড়ানো শ্রান্ত 'ওয়ালট্‌জ্' রাগিণীর আর্ত্ত সুর হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বেরুচ্ছে! তূর্য্য-বাদকের স্বর ঘন ঘন ভেঙে যাচ্ছে! আজ অন্ধ সেনানী দারার বিদায়ের দিন! অন্ধ বধির আহত দারা যখন আমার কাঁধে ভর ক'রে সৈনিকদের সাম্‌নে দাঁড়াল, তখন সমস্ত মুক্তিসেবক সেনার নয়ন দিয়ে হু-হু ক'রে অশ্রুর বন্যা ছুটছে! আমাদের কঠোর সৈনিকদের কান্না যে কত মর্ম্মন্তুদ, তা' বোঝাবার ভাষা নেই। মুক্তিসেবক-সৈন্যাধ্যক্ষ ব'ললেন,—তাঁর স্বর বারংবার অশ্রুজড়িত হ'য়ে যাচ্ছিল,—"ভাই দারাবী! আমাদের মধ্যে 'ভিক্টোরিয়া ক্রস্', 'মিলিটারী ক্রস্' প্রভৃতি পুরস্কার দেওয়া হয় না, কেননা আমরা নিজে নিজেই তো

আমাদের কাজকে পুরস্কৃত ক'রতে পারিনে। আমাদের বীরত্বের, ত্যাগের পুরস্কার বিশ্ববাসীর কল্যাণ; কিন্তু যারা তোমার মত এই রকম বীরত্ব আর পবিত্র নিঃস্বার্থ ত্যাগ দেখায়, আমরা শুধু তাদেরই বীর বলি!"

সৈন্যাধ্যক্ষ পুনরায় ঢোক গিলে আর কোটের আস্তিনে তাঁর অবাধ্য অশ্রু-ফোটা ক'টা মুছে নিয়ে ব'ল্লেন,—"তুমি অন্ধ হ'য়েছ, তুমি বধির হ'য়েছ, তোমার সারা অঙ্গে জখমের কঠোর চিহ্ন, আমরা ব'লব, এই তোমার বীরত্বের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার! অনাহূত-তুমি বিশ্বের মঙ্গল-কামনায় প্রাণ দিতে এসেছিলে, তার বিনিময়ে খোদা নিজ হাতে যা দিয়েছেন, হোক্ না কেন তা বাইরের চোখে নির্ম্মম—তার বড় পুরস্কার, মানুষ আমরা কি দেব ভাই? "খোদা নিশ্চয়ই মহান্ এবং তিনি ভাল কাজের জন্যে লোকদের পুরস্কৃত করেন!"—এ যে তোমাদেরই পবিত্র কোর্‌আনের বাণী! অতএব হে বীর সেনানী, হয়তো তোমার এই অন্ধত্ব ও বধিরতার বুকেই সব শান্তি সব সুখ সুপ্ত র'য়েছে! খোদা তোমায় শান্তি দিন!"

দারা তার দৃষ্টিহীন চোখ দু'টো দিয়ে যত দূর সাধ্য সৈনিক-গণকে দেখবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে অশ্রুচাপা কণ্ঠে শুধু ব'লতে পেরেছিল,—"বিদায়, পবিত্র বীর ভাইরা আমার!"

আমিও অন্ধ দারার সঙ্গে আবার এই গোলেস্তানেই এলাম! আর এই তো আমার ব্যর্থ জীবনের সান্ত্বনা, এই নির্ব্বিকার বীরের সেবা! দারা আমায় ক্ষমা ক'রেছে, আমায় সখা ব'লে কোল দিয়েছে! এতদিনে না এই হতভাগ্য যুবকের রিক্ত জীবন সার্থকতার পুষ্পে পুষ্পিত হ'য়ে উঠ্‌ল! এতদিনে না

সত্যিকার ভালবাসায় তাকে ঐ অসীম আকাশের মতই অনন্ত উদার ক'রে দিলে! রাস্তায় আস্‌তে আস্‌তে তাকে জিজ্ঞেস ক'রলাম,—"আচ্ছা ভাই, তুমি বেদৌরাকে ক্ষমা ক'রেছ?"

সে কান্না-ভরা হাসি হেসে সাধকশ্রেষ্ঠ প্রেমিক রুমীর এই গজলটা গাইলে,—

> "ওগো প্রিয়তম, তুমি যত বেদনার শিলা দিয়ে আমার বুকে
> আঘাত ক'রেছ, আমি তাই দিয়ে যে প্রেমের মহান্
> মস্‌জিদ তৈরী ক'রেছি!"

আমার বিশ্বাস, শিশুদের চেয়ে সরল আর কিছু নেই দুনিয়ায়। দারাও প্রেমের মহিমায় যেন অম্‌নি সরল শিশু হ'য়ে প'ড়েছে। তার মুখে কেমন সহজ হাসি, আবার কেমন অসঙ্কোচ কান্না! তা কিন্তু অতি বড় পাষাণকেও কাঁদায়! আমি সে-দিন হাস্‌তে হাস্‌তে ব'ললাম,—"হাঁ ভাই, এই যে তুমি অন্ধ আর বধির হ'য়ে গেলে, এতে মঙ্গলময়ের কোন মঙ্গলের আভাস পাচ্ছ কি?"

সে ব'ললে,—"ওরে বোকা, এই যে তোদের আজ ক্ষমা ক'রতে পেরেছি—এই যে আমার মনের সব গ্লানি সব ক্লেদ ধুয়ে-মুছে সাফ্ হ'য়ে গিয়েছে, সে এই অন্ধ হ'য়েছি ব'লেই তো,—এই বাইরের চোখ দু'টোকে কাণা ক'রে আর শ্রবণ দু'টোকে বধির ক'রেই তো! অন্ধেরও একটা দৃষ্টি আছে, সে হ'চ্ছে অন্তর্দৃষ্টি বা অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি। এখন আমি দেখ্‌ছি দুনিয়া-ভরা শুধু প্রিয়ার রূপ আর তারই হাসির অনন্ত আলো। আর এই কালা কান দু'টো দিয়ে কি শুন্‌ছি, জানিস্? শুধু তার কানে-কানে-বলা গোপন-প্রেমালাপের মঞ্জু গুঞ্জন আর চরণ-

ভরা মঞ্জীরের রুণু-ঝুনু বোল!—আমি যে এই নিয়েই মশ্‌গুল!" ব'লেই অভিভূত হ'য়ে সে গান ধ'রলে,—

"যদি আর কারে ভালবাস, যদি আর নাহি ফিরে আস,
তবে তুমি যাহা চাও, তাই যেন পাও, আমি যত দুখ পাই গো!
আমার পরাণ যাহা চায়, তুমি তাই তুমি তাই গো,
তুমি ছাড়া মোর এ জগতে আর কেহ নাই কিছু নাই গো!"

কানাড়া রাগিণীর কোমল গান্ধারে আর নিখাদে যেন তার সমস্ত আবিষ্ট বেদনা মূর্ত্তি ধ'রে মোচড় খেয়ে খেয়ে কেঁদে যাচ্ছিল! কিন্তু কত শান্ত স্নিগ্ধ বিরাট্ নির্ভরতা আর ত্যাগ এই গানে!

সব চেয়ে আমার বেশী আশ্চর্য্য বোধ হ'চ্ছে, যে, বেদৌরাও আমাকে ক্ষমা ক'রেছে, অথচ তার এ-বলায় এতটুকু কৃত্রিমতা বা অস্বাভাবিকতা নেই। এ যেন প্রাণ হ'তে ক্ষমা ক'রে বলা!

খোদা, তুমি মহান্! "যার কেউ নেই, তুমি তার আছ!" এই প্রেমিকদের সোনার কাঠির স্পর্শে আমি-যে-আমি, তারও আর কোন গ্লানি নেই, সঙ্কোচ নেই!

আজ এই বিনা কাজের আনন্দ,—উঃ, তা' কত মধুর আর সুন্দর!

বেদৌরার কথা

গোলেস্তান্

নির্ঝরের অপর পারে

তিনি আমায় ক্ষমা ক'রেছেন একেবারে প্রাণ খুলে, হৃদয় হ'তে; এবার এ-ক্ষমায় এতটুকু দীনতা নেই। এ যে হবেই, তা' তো আমি জানতামই, আর তাই যে এমন ক'রে আমার প্রতীক্ষার সকাল-সাঁঝগুলি আনন্দেই কেটে গিয়েছে! আমার এই আশায়-ব'সে-থাকা দিনগুলি, বিরলে-গাঁথা ফুলহারগুলি আর বেদনা-বারিসিক্ত বিরহ গানগুলি তারই পায়ে ঢেলে দিয়েছি। তিনি তা গলায় তুলে নিয়ে তার বিনিময়ে যা দিয়েছেন, সেই তো গো তাঁর আমায়-দেওয়া ব্যথার দান।

তিনি ব'ললেন,—"বেদৌরা! কামনা আর প্রেম, এ দু'টো হ'চ্ছে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। কামনা একটা প্রবল সাময়িক উত্তেজনা আর প্রেম হ'চ্ছে ধীর, প্রশান্ত ও চিরন্তন। কামনার প্রবৃত্তি বা তার নিবৃত্তিতে হৃদয়ের দাগ-কাটা ভালবাসাকে যে ঢাকতেই পারে না, এ হ'চ্ছে ধ্রুব সত্য। এই রকম বিড়ম্বিত যে বেচারারা এই কথাটা একটু তলিয়ে দেখে ধীরভাবে বিশ্বাস করে না, তারা মস্ত ভুল করে, আর তাদের মত হতভাগ্য

অশান্ত জীবনও আর কারুর নেই। বাদলার দিনে কালো মেঘগুলো সূর্য্যকে গ্রাস ক'রতে যতই চেষ্টা করুক, তা' কিন্তু পারে না। তবে তাকে খানিক ক্ষণের জন্যে আড়াল ক'রে থাকে মাত্র। কেননা সূর্য্য থাকে মেঘের নাগাল পাওয়ার অনেক দূরে। কোন্ ফাঁকে আর সে কেমন ক'রে যে অত মেঘের পুরু স্তর ছিঁড়ে রবির কিরণ দুনিয়ার বুকে প্রতিফলিত হয়, তা মেঘেও ভেবে পায় না, আর আমরাও জানতে চেষ্টা করি নে। তার পর মেঘ কেটে গেলেই সূর্য্য হাস্‌তে থাকে আরও উজ্জ্বল হ'য়ে। কারণ তাতে তো সূর্য্যের কোন অনিষ্টই হয় না,—সে জানে, সে যেমন আছে তেমনি অটুট থাক্‌বেই ; ক্ষতি যা তোমার আমার—এই দুনিয়ার। তাই ব'লে কি বাদলের মেঘ আসবে না ? সে এসে আকাশ ছাইবে-না ? সে আসবেই, ও যে স্বভাব ; তাকে কেউ রুখ্‌তে পার্‌বে না। তবে অত বাদলেও সূর্য্য-কিরণ পেতে হ'লে মেঘ ছাড়িয়ে উঠ্‌তে হয়। সেটা তেমন সোজা নয়, আর তা দরকারও করে না। কামনাটা হ'চ্ছে ঠিক এই বাদলের মত ; আর প্রেম জ্ব'লছে হৃদয়ে ঐ রবিরই মত একই ভাবে সমান ঔজ্জ্বল্যে !

"কামনায় হয়তো তোমার বাহিরটা নষ্ট ক'রেছে, কিন্তু ভিতরটা তো নষ্ট ক'রতে পারে নি। তা ছাড়া, ও না হ'লে যে তুমি আমাকে এত বেশী ক'রে চিনতে না, এত বড় ক'রে পেতে না। বাইরের বাতাস প্রেমের শিখা নিবাতে পারে না, আরও উজ্জ্বল ক'রে দেয়। আর আমার অন্ধত্ব ও বধিরতা'? ওর জন্যে কেঁদো না বেদৌরা, এ-গুলো থাক্‌লে তো আমি তোমায় আর পেতাম না।"

পুষ্পিত সেব গাছ থেকে অশ্রুচাপা কণ্ঠে 'পিয়া পিয়া' ক'রে বুল্‌বুল্‌গুলো উড়ে গেল!

তিনি আবার ব'ললেন,—"দেখ বেদৌরা, আজ আমাদের শেষ বাসর-শয্যা হবে। তার পর রবির উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তুমি চ'লে যাবে নিঝরটার ও-পারে, আর আমি থাক্‌ব এ-পারে। এই দু'-পারে থেকে আমাদের দু'-জনেরই বিরহ-গীতি দুই জনকে ব্যথিয়ে তুল্‌বে। আর ঐ ব্যথার আনন্দেই আমরা দু'-জনে দু'-জনকে আরও বড়—আরও বড় ক'রে পাব!"

সেই দিন থেকে আমি নিঝরটার এ-পারে।

আমারও অশ্রু-ভরা দীর্ঘশ্বাস হু-হু ক'রে ওঠে, যখন মৌনবিষাদে-নীরব সন্ধ্যায় তাঁর ভারী চাপা কণ্ঠ ছেপে একটা ক্লান্ত রাগিণী ও-পার হ'তে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে এ-পারে এসে বলে,—

"আমার সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে দিবস গেলে ক'র্‌ব নিবেদন,
আমার ব্যথার পূজা হয় নি সমাপন!"

হেনা

'স্বরাজ' বলেন—

"গদ্যের ভিতরেও যে একটা ছন্দ আছে, একটা মাত্রা আছে, কাজী নজরুলের এই বইখানি পড়িলে তাহা অতি সহজেই ধরা পড়ে। এক কথায় বইখানির ভাষা ছন্দময়। প্রকৃতির ভিতরকার রূপ এবং রস পুঞ্জীভূত হইয়া তাঁহার লেখার ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।"

*　　　*　　　*

"ওরে আয়!
ঐ　　মহা-সিন্ধুর পার হ'তে ঘন রণ-ভেরী শোনা যায়—
ওরে আয়!
তোর　　জান যায় যাক্, পৌরুষ তোর মান যেন নাহি যায়!
তোর　মান যায় প্রাণ যায়!
তবে　　বাজাও বিষাণ, ওড়াও নিশান! বৃথা ভীরু সমঝায়!
রণ-দুর্ম্মদ রণ চায়!
ওরে আয়!
ঐ　　মহা-সিন্ধুর পার হ'তে ঘন রণ-ভেরী শোনা যায়!

*　　　*　　　*

লাল-　　পল্টন মোরা সাচ্চা,
মোরা সৈনিক, মোরা শহীদান বীর-বাচ্চা,
মরি　　জালিমের দাঙ্গায়!
মোরা　অসি বুকে বরি' হাসি মুখে মরি' 'জয় স্বাধীনতা' গাই!
ওরে আয়!
ঐ　　মহা-সিন্ধুর পার হ'তে ঘন রণ-ভেরী শোনা যায়!"

—অগ্নিবীণা—

*　　　*　　　*

হাবিলদার-বেশে কাজী নজরুল ইসলাম

—ব্যথার দান—

হেনা

ভার্দ্দুন ট্রেঞ্চ, ফ্রান্স

ওঃ! কি আগুন-বৃষ্টি! আর কি তার ভয়ানক শব্দ!—গুড়ুম্—দ্রুম্—দুম্! আকাশের একটুও নীল দেখা যাচ্ছে না, যেন সমস্ত আস্‌মান জুড়ে আগুন লেগে গেছে! গোলা আর বোমা ফেটে ফেটে আগুনের ফিন্‌কি এত ঘন বৃষ্টি হ'চ্ছে যে, অত ঘন যদি জল ঝ'রত আস্‌মানের নীল চক্ষু বেয়ে, তা' হ'লে এক দিনেই সারা দুনিয়া পানিতে সয়লাব হ'য়ে যেত! আর এম্‌নি অনবরত যদি এই বাজের চেয়েও কড়া 'দ্রুম্—দ্রুম্' শব্দ হ'ত, তা' হ'লে লোকের কানগুলো একেবারে অকেজো হ'য়ে যেত। আজ শুধু আমাদের সিপাইদের সেই 'হোলি' খেলার গানটা মনে প'ড়ছে,—

"আজু তল্‌ওয়ার সে খেলেঙ্গে হোরি,
জমা হো গেয়ে দুনিয়া কা সিপাঈ।
ঢালোঁও কি ডঙ্কা বাদন লাগি, তোপঁও কে পিচকারী,
গোলা বারুদকা রঙ্গ্ বনি হেয়, লাগি হেয় ভারী লড়াঈ!"

বাস্তবিক এ গোলা-বারুদের রঙে আস্‌মান জমিন লালে লাল হ'য়ে গেছে! সব চেয়ে বেশী লাল ঐ বুকে 'বেয়নেট'-পোরা হতভাগাদের বুকের রক্ত। লালে লাল! শুধু লাল আর লাল! এক একটা সিপাই 'শহীদ' হ'য়েছে, আর যেন বিয়ের 'নওশা'র মত লাল হ'য়ে শুয়ে আছে।

ওঃ! সব চেয়ে বিশ্রী ঐ ধোঁওয়ার গন্ধটা। বাপ্‌রে বাপ্‌! ওর গন্ধে যেন বত্রিশ নাড়ী পাক দিয়ে ওঠে। মানুষ, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব, তাদের মারবার জন্যে এ-সব কি কুৎসিৎ নিষ্ঠুর উপায়। রাইফ্‌লের গুলির প্রাণহীন সীসাগুলো যখন হাড়ে এসে ঠেকে, তখন সেটা কি বিশ্রী রকম ফেটে চৌচির হ'য়ে দেহের ভিতরের মাংসগুলোকে ছিঁড়ে বেরিয়ে যায়।

এত বুদ্ধি মানুষ অন্য কাজে লাগালে তারা ফেরেশ্‌তার কাছাকাছি একটা খুব বড় জাত হ'য়ে দাঁড়াত।

ওঃ! কি বুক-ফাটা পিয়াস! এই যে পাশের বন্ধু রাইফ্‌ল্‌টা কাৎ ক'রে ফেলে ঘুমিয়ে প'ড়েছে, একে আর হাজার কামান এক সঙ্গে গ'র্জ্জে উঠ্‌লেও জাগাতে পারবে না—কোন সেনাপতিও আর তার হুকুম মানাতে পারবে না। এই সাত দিন ধ'রে একরোখা ট্রেঞ্চে কাদায় শুয়ে শুয়ে অনবরত গুলি ছোড়ার ক্লান্তির পর সে কি নিবিড় শান্তি নেমে এসেছে এর প্রাণে। তৃপ্তির কি স্নিগ্ধ স্পর্শ এখনো লেগে র'য়েছে এর শুষ্ক শীতল ওষ্ঠপুটে!

যাক্,—যে ভয়ানক পিয়াস লেগেছে এখন আমার! এখন ওর কোমর থেকে জলের বোতলটা খুলে একটু জল খেয়ে জানটা ঠাণ্ডা করি তো। কা'ল থেকে আমার জল ফুরিয়ে

গিয়েছে, কেউ এক ফোটা জল দেয় নি।—আঃ! আঃ! এই গভীর তৃষ্ণার পর এই এক চুমুক জল, সে কত মিষ্টি। অনবরত চালিয়ে চালিয়ে আমার 'লুইস্ গান'টাও আর চ'ল্‌ছে না। এখন আমার মৃত বন্ধুর লুইস্ গানটা দিয়ে দিব্যি কাজ চ'ল্‌বে! এর যদি মা কিংবা বোন্ কিংবা স্ত্রী থাক্‌ত আজ এখানে, তা' হ'লে এর এই গোলার আঘাতে ভাঙা মাথার খুলিটা কোলে ক'রে খুব এক চোট কেঁদে নিত! যাক্, খানিক পরে একটা বিশ পঁচিশ মনের মস্ত ভারী গোলা হয়তো ট্রেঞ্চের সাম্‌নেটায় প'ড়ে আমাদের দু'-জনাকেই গোর দিয়ে দেবে! সে মন্দ হবে না।

হাঁ, আমার এত হাসি পাচ্ছে ঐ কান্নার কথা মনে হ'য়ে! আরে ধ্যেৎ, সবাই ম'রব, ; আমি'ম'র্‌ব, তুইও ম'র্‌বি। এত বড় একটা নিছক সত্যি একটা স্বাভাবিক জিনিস নিয়ে কান্না কিসের?

এই যে এত কষ্ট, এত মেহনৎ ক'র্‌ছি, এত জখম্ হ'চ্ছি, তবুও সে কি একটা পৈশাচিক আনন্দ আমার বুক ছেয়ে ফেল্‌ছে! সে আনন্দটা এই কাঠ পেন্সিলটার সীসা দিয়ে এঁকে দেখাতে পারছি নে! মস্ত ঘন ব্যথার বুকেও একটা বেশ আনন্দ ঘুম-পাড়ানো থাকে, যেটা আমরা ভাল ক'রে অনুভব ক'র্‌তে পারি নে। এই লেখা অভ্যেসটা কি খারাব! এত আগুনের মধ্যে সাঁত্‌রে বেড়াচ্ছি,—পায়ের নীচে দশ বিশটা মড়া, মাথার ওপর উড়ো জাহাজ থেকে বোমা ফাট্‌ছে—দুম্—দুম্—দুম্, সামনে বিশ হাত দূরে বড় বড় গোলা ফাট্‌ছে গুড়ুম গুড়ুম, পাশ দিয়ে চ'লে যাচ্ছে 'রাইফ্‌ল' আর 'মেশিন

গানে'র গুলি—শোঁ, শোঁ, শোঁ,—তবুও এই সাতটা দিন মনের কথাগুলো খাতার কাগজগুলোকে না জানাতে পেরে জানটাকে কি ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুল্‌ছিল! আজ এই ক'টা কথা লিখে বুকটা বেশ হাল্কা বোধ হ'চ্চে!

পাশের মরা বন্ধুর গায়ে ঠেস দিয়ে দিব্যি একটু আরাম ক'রে নেওয়া যাক্!—ওঃ কি আরাম!

এই সিন্ধুপারের একটা অজানা বিদেশিনী ছোট্ট মেম আমায় খানিকটা আচার আর দু'টো মাখন-মাখা রুটী দিয়েছিল। সেটা আর খাওয়াই হয় নি। এ-দেশের মেয়েরা আমাদের এত স্নেহের আর করুণার চক্ষে দেখে! হা—হা—হা—হাঃ, রুটী দু'টো দেখ্‌ছি শুকিয়ে দিব্যি 'রোষ্ট' হ'য়ে আছে! দেখা যাক্, রুটী শক্ত না আমার দাঁত শক্ত! ওই খেতে হবে কিন্তু, পেটে যে আগুন জ্ব'লছে! আচারটা কিন্তু বেড়ে তাজা আছে দেখছি!

ঐ তের চৌদ্দ বছরের কচি মেয়েটা (আমাদের দেশে ও-রকম মেয়ে নিশ্চয়ই সন্তানের জননী নতুবা যুবতী গিন্নী!) যখন আমার গলা ধ'রে চুমো খেয়ে ব'ললে,—"দাদা, এ লড়াইতে কিন্তু শত্তুরকে খুব জোর তাড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে", তখন আমার মুখে সে কি একটা পবিত্র বেদনা-মাখা হাসি ফুটে উঠেছিল।

আঃ! এতক্ষণে আকাশটা বেরোবার একটু ফাঁক পেয়েছে। রাশি রাশি জল-ভরা মেঘের ফাঁকে এক একটু নীল আস্‌মান দেখা যাচ্ছে। সে কত সুন্দর! ঠিক যেন অশ্রু-ভরা চোখের ঈষৎ একটু সুনীল রেখা!

থাক্ গে এখন, অন্য সময় বাকী কথাগুলো লেখা যাবে। মরা বন্ধুর আত্মা হয়তো আমার ওপর চ'টে উঠেছে এতক্ষণ! কি বন্ধু একটু জল দেবো নাকি মুখে?—ইস্, হাঁ ক'রে তাকাচ্ছেন দেখ! না বন্ধু—না, তোমার পরপারের প্রিয়তমা হয়তো তোমার জন্যে শরবতের গেলাস-হাতে দাঁড়িয়ে র'য়েছে! আহা, সে বেচারীকে বঞ্চিত ক'র্‌বো না তার সেবার আনন্দ থেকে!

আজ কত কথাই মনে হ'চ্ছে,—না—না, কিচ্ছু মনে হ'চ্ছে না, সব ঝুটা! ফের লুইস্ গানটায় গুলি চালানো যাক্!—আমার সাহায্যকারী কয় জন বেশ তোয়াজ ক'রে ঘুমিয়ে নিলে তো দেখ্‌ছি!

ঐ—ঐ, পাশে কা'দের তালে তালে পা মিলিয়ে চলার শব্দ পাচ্ছি! ঝপ্ ঝপ্ ঝপ্—লেফ্‌ট রাইট্ লেফ্‌ট্! ঐ মিলিয়ে চলার শব্দটা কি মধুর! ও বুঝি আমাদের 'রিলিভ' ক'রতে আসছে অন্য পল্টন।

উঃ! এতটুকু অসাবধানতার জন্যে হাতের এক টুকরো মাংস ছিঁড়ে নিয়ে গেল দেখছি একটা গুলিতে। . . . 'ব্যাণ্ডেজ'টা বেঁধে নিই নিজেই। 'নার্স'গুলোকে আমি দু'-চোখে দেখতে পারি নে। নারী যদি ভাল না বেসে সেবা করে আমার, তবে সে-সেবা আমি নেব কেন?

আঃ, যুদ্ধের এই খুনোখুনির কি মাদকতা-শক্তি! মানুষ-মারার কেমন একটা গাঢ় নেশা!

পাশে আমার চেয়ে অত বড় জোয়ানটা এলিয়ে প'ড়েছে দেখছি! আমি দেখছি শরীরের বলের চেয়ে মনের বলের শক্তি অনেক বেশী।

লুইস্ গানে এক মিনিটে প্রায় ছয় সাত শ' ক'রে গুলি ছাড়ছি। যদি জান্‌তে পার্‌তুম ওতে কত মানুষ ম'র্‌ছে! তা হোক, এই দু' কোণের দু'টো লুইস্ গানই শত্রুদের জোর আটকিয়ে রেখেছে কিন্তু। কি চীৎকার ক'রে ম'রছে শত্রুগুলো দলে দলে! কি ভীষণ সুন্দর এই তরুণের মৃত্যু-মাধুরী!

সিঁন নদীর ধারে তাম্বু, ফ্রান্স

এই দু'টো দিনের আটচল্লিশ ঘণ্টা খালি লম্বা ঘুম দিয়ে কাটিয়ে দেওয়া গেল। এখন আবার ধরা-চূড়ো প'রে বেরুতে হবে খোদার সৃষ্টি নাশ ক'রতে। এই মানুষ-মারা বিদ্যে লড়াইটা ঠিক আমার মত পাথর-বুকো কাঠখোট্টা লোকেরই মনের মত জিনিস।

আজ সেই বিদেশিনী কিশোরী আমাকে তাদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিল। কি পরিষ্কার সুন্দর ফিটফাট্ বাড়ীগুলো এদের! মেয়েটা আমাকে খুব ভালবেসেছে। আমিও বেসেছি। আমাদের দেশ হ'লে ব'লত মেয়েটা খারাব হ'য়ে যাচ্ছে! কুড়ি একুশ বছরের এক জন যুবকের সঙ্গে একটা কুমারী কিশোরীর মেলা-মেশা তারা আদৌ পসন্দ ক'রত না!

ভালবাসাটাকে কি কুৎসিৎ চক্ষে দেখছে আজ-কাল লোকেরা! মানুষ তো নয়, যেন শকুনি! দুনিয়ায় এত পাপ! মানুষ এত ছোট হ'ল কি ক'রে? তাদের মাথার ওপর অমন উদার অসীম নীল আকাশ, আর তারই নীচে মানুষ কি সঙ্কীর্ণ, কি ছোট!

আগুন, তুমি ঝর—ঝম্ ঝম্ ঝম্! খোদার অভিশাপ তুমি নেমে এস ঐ নদীর বুকের জমাট বরফের মত হ'য়ে- ঝুপ্, ঝুপ্, ঝুপ্! ইস্‌রাফিলের শিঙ্গা, তুমি বাজো সবকে নিসাড় ক'রে দিয়ে—ওম্ ওম্ ওম্! প্রলয়ের বজ্র, তুমি কামানের গোলা আর বোমার মধ্যে দিয়ে ফাট—ঠিক মানুষের মগজের ওপরে —দ্রুম্—দ্রুম্—দ্রুম্! আর সমস্ত দুনিয়াটা—সমস্ত আকাশ উল্‌টে ভেঙে পড় তাদের মাথায়, যারা ভালবাসায় কলঙ্ক আনে, ফুলকে অপবিত্র করে।

এখন যে সাজে সেজেছি, ঠিক এই রকম সাজে যদি আমাদের দেশের একটা লোককে সাজিয়ে উল্‌টে ফেলে দিই, তা' হ'লে হাজার ধ্বস্তাধ্বস্তি ক'রেও সে আর উঠতে পারবে না। আমার নিজেরই হাসি পাচ্ছে আমার এখনকার এই গদাই-লশ্‌করী চেহারা দেখে!

আমার এক 'ফাজিল' বন্ধু ব'লছেন,—"কি নিমকিন চেহারা!"—আহা কি উপমার ছিরি! কে নাকি ব'লেছিল,—"ষাঁড়টা দেখতে যেন ঠিক কাৎলা মাছ!"

প্যারিসের পাশের ঘন বন

কাল হঠাৎ এই মস্ত জঙ্গলটায় আস্‌তে হ'ল। কেন এ রকম পিছিয়ে আসতে হ'ল তার এতটুকুও জান্‌তে পারলুম না! এ মিলিটারী লাইনের ঐটুকুই সৌন্দর্য্য! তোমার ওপর হুকুম হ'ল,

"ঐ কাজটা কর!" "কেন ও-রকম ক'রব?" তার কৈফিয়ৎ চাইবার কোন অধিকার নেই তোমার। বাস্—হুকুম!

যদি বলি, "মৃত্যু যে ঘনিয়ে আস্ছে!"—অমনি বজ্রগম্ভীর স্বরে তার কড়া জবাব আস্বে,—যতক্ষণ তোমার নিশ্বাস আছে, ততক্ষণ কাজ ক'রে যাও, যদি চ'ল্তে চ'ল্তে তোমার ডান পায়ের ওপর মৃত্যু হয়, তবে বাম পা পর্য্যন্ত চল!"

এই হুকুম মানায়, এই জীবন-পণ আনুগত্যে কত যে নিবিড় মাধুরী! বাজের মাঝে এ কি কোমলতা! যদি সমস্ত দুনিয়াটা এম্নি একটা (এবং কেবল একটা) সামরিক শক্তির অধীন হ'য়ে যেত, তা' হ'লে এই মাটীর জমিনই এমন একটা সুন্দর স্থান হ'য়ে দাঁড়াত, যা'কে "জিন্নতল বাকিয়া" (শ্রেষ্ঠতম স্বর্গ) ব'ললেও লোকে তৃপ্ত হ'ত না!

কি শৃঙ্খলা এই ব্রিটিশ জাতিটার কাজে-কর্ম্মে কায়দা-কানুনে, তাই তারা আজ এত বড়। ওপর দিকে চাইতে গিয়ে আমাদের মাথার পাগড়ী প'ড়ে গেলেও তাদের মাথাটা দেখতে পাব না! মোটামুটি ব'লতে গেলে তাদের এই দুনিয়া-জোড়া রাজত্বিটা একটা মস্ত বড় ঘড়ি, আর সেটা খুবই ঠিক চ'লছে, কেননা তার সেকেণ্ডের কাঁটা থেকে ঘণ্টার কাঁটা পর্য্যন্ত সব তাতে বড্ডো কড়া বাঁধাবাঁধি একটা নিয়ম। সেটা আবার রোজই 'অয়েল্ড' হ'চ্ছে, তার কোথাও একটু জং ধরে না।

আমরাই নিয়ে গেলুম জর্ম্মানদের 'হিণ্ডেন্‌বার্গ লাইন' পর্য্যন্ত খেদিয়ে, আবার আমাদেরই এতটা পিছিয়ে যেতে হ'ল! ঘড়িটা যে তৈরী ক'রেছে, সে জানে কোন্ কাঁটার কোন্ খানে কি কাজ, কিন্তু কাঁটা কিছু বুঝতে পারে না। তবু তাকে কাজ

ক'রে যেতে হবে, কেননা একটা স্প্রিং অনবরত তার পেছন থেকে তাকে গুঁতো মারছে!

এমনি একটা বিরাট্ কঠিন শৃঙ্খল, মস্ত বাঁধাবাঁধি আমাদের খুবই দরকার। আমাদের এই 'বেড়ে' জাতটাকে এমনি খুব পিঠ্‌মোড়া ক'রে বেঁধে দোরস্ত না ক'রলে এর ভবিষ্যতে আর উঠে দাঁড়াবার কোন ভরসাই নেই! দেশের সবাই মোড়ল হ'লে কি আর কাজ চলে!

ওঃ, এত দূরেও আমাদের উপর গোলাবৃষ্টি! এ যেন একটা ভূতুড়ে কাণ্ড। কোথায় কোন্ সুদূরে লড়াই হ'চ্ছে, আর এখানে কি ক'রে এই জঙ্গলে গোলা আস্‌ছে?

হাতী যখন ভাবে, তার চেয়ে বড় জানোয়ার আর নেই, তখন ছোট্ট একটা মশা তার মগজে কাম্‌ড়ে কি রকম 'ঘায়েল' ক'রে দেয় তাকে!

এখানে এই গাছ-পালার আড়ালে একটা স্নিগ্ধ ছায়ার অন্ধকারে বেশ থাকা যাচ্ছে, কিন্তু এমনি একটু অন্ধকারের জন্যে আমার জানটা বড্ডো বেশী আকুলি-বিকুলি ক'রে উঠেছিল!

হায়! এই অন্ধকারে এলে কত কথাই মনে পড়ে আমার আবার!—নাঃ! যাই একবার গাছে চ'ড়ে দেখি আশে পাশে কোথাও দুষ্‌মন লুকিয়ে আছে কি না।

আহা, গাছ থেকে ঐ দূরে বরফে-ঢাকা নদীটা কি সুন্দর! আবার ঐ গোলার ঘায়ে ভাঙা মস্ত বাড়ীগুলো কি বিশ্রী হাঁ ক'রে আছে। এই সব ভাঙা-গড়া দেখে আমার সেই ছোট্ট বেলাকার কথা মনে পড়ে। তখন আমরা খুব ঘটা ক'রে ধূলো-

বালির ঘর বানাতুম। তার পর খেলা শেষ হ'লে সে-গুলোকে পা দিয়ে ভেঙে দিতুম, আর সমস্বরে ভাঙার গান গাইতুম,—

"হাতের সুখে বানালুম,
পায়ের সুখে ভাঙলুম!"

অনেক দূরে ঐ কামানের গোলাগুলো প'ড়ছে আর এখান থেকে দেখাচ্ছে যেন আস্‌মানের বুক থেকে তারাগুলো খ'সে খ'সে প'ড়ছে!

ওঃ, কি বোঁ—বোঁ শব্দ! ঐ যে মস্ত উড়ো জাহাজ কি ভয়ানক জোরে ঘুরছে, উঠ্‌ছে আর নাম্‌ছে। ঠিক যেন একটা চিলেঘুড়িকে খেলোয়াড় গোঁতা মারছে! ওটা আমাদেরই। জর্ম্মানদের জেপেলিনগুলো দূরে থেকে দেখায় যেন একটা বড় শুঁয়ো পোকা উড়ে যাচ্ছে।

যাক্, আমার 'হ্যাভার স্যাক্' থেকে একটু আচার বের ক'রে খাওয়া যাক্। সেই বিদেশিনী মেয়েটা আজ কত দূরে, কিন্তু তার ছোঁওয়া যেন এখনও লেগে র'য়েছে এই ফলের আচারে!—দূর ছাই! যত সব বাজে কথা মনে হয় কেন? খামখা সাত ভূতের বেদ্‌না এসে জানটা ক'চলে ক'চলে দিয়ে যায়।

হা—হা—হা—হাঃ, বন্ধু আমার পাশের গাছটায় ব'সে ঘুমোবার চেষ্টা ক'রছেন দেখ্‌ছি। ঐ যে দিব্যি কোমরবন্ধটা দিয়ে নিজেকে একটা ডালের সঙ্গে বেশ শক্ত ক'রে বেঁধেছেন। একবার প'ড়েন যদি ঝুপ্ ক'রে ঐ নীচের জলটায়, তা' হ'লে বেড়ে একটা রগড় হয় কিন্তু! পড়িস্ আল্লা করে—এই সড়াৎ দূ—ম্! . . .

দেবো নাকি তার কানের গোড়া দিয়ে সাঁ ক'রে একটা পিস্তলের গুলি ছেড়ে? আহা-হা, না না ঘুমুক বেচারা! আমার মতন এমন পোড়া চোখ তো আর কারুর নেই, যে, ঘুম আসবে না, আর এমন পোড়া মনও কারুর নেই, যে, সারা দুনিয়ার কথা ভেবে মাথা ধরাবে!

রাত্রি হ'য়েছে,—অনেকটা হবে! ভোর পর্য্যন্ত এমনি ক'রেই কুঁক্ড়ো অবতার হ'য়ে থাকতে হবে। . . . . বুড়ো কালে (অবশ্য, যদি তত দিন বেঁচে থাকি!) এই সব কথা আর খাটুনীর স্মৃতি কি মধুর হ'য়ে দেখা দেবে!

মেঘ ছিঁড়ে পূর্ণিমার আগের দিনের চাঁদের জ্যোছনা কেমন ছিটে-ফোটা হ'য়ে প'ড়ছে সারা বনটার বুকে! এখন সমস্ত বনটাকে একটা চিতা বাঘের মত দেখাচ্ছে!

কালো ভারী জমাট মেঘগুলো আমার মাথার দু' হাত ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে কোথায় ভেসে উধাও হ'য়ে যাচ্ছে, আর তারই দু'-এক ফোটা শীতল জল আমার মাথায় প'ড়ছে টপ্—টপ্—টপ্! কি করুণ শীতল সে জমাট মেঘের দু' ফোটা জল! আঃ!

চাঁদটা একবার ঢাকা প'ড়ছে, আবার সাঁ ক'রে বেরিয়ে আর একটা মেঘে সেঁধিয়ে প'ড়ছে! এ যেন বাদশাহ্‌জাদার শীশ্‌মহলের সুন্দরীদের সাথে লুকোচুরি খেলা। কে ছুট্‌ছে? চাঁদ, না মেঘ? আমি ব'লব 'মেঘ', একটী সরল ছোট্ট শিশু ব'লবে 'চাঁদ'। কার কথা সত্যি?

আহা, কি সুন্দর আলো-ছায়া!

দূরে ওটা কি একটা পাখী অমন ক'রে ডাক্‌ছে? এ

দেশের পাখীগুলোর সুর কেমন একটা মধুর অলসতায় ভরা! শুন্‌লে যেন নেশা ধরে।

এই আলো-ছায়ায় আমার কত কথাই না মনে প'ড়ছে! ওঃ, তার চিন্তাটা কি ব্যথায় ভরা!

আমার মনে প'ড়ছে, আমি ব'ললুম,—"হেনা, তোমায় বড্ডো ভালবাসি!"

সে, হেনা তার কস্তূরীর মত কালো পশমিনা অলক-গোছা দুলিয়ে দুলিয়ে ব'ললে,—"সোহর্‌াব, আমি যে এখনও তোমায় ভালবাসতে পারি নি!"

সে দিন জাফরানের ফুলে যেন 'খুন্‌-খোশ্‌রোজ' খেলা হ'চ্ছিল বেলুচিস্থানের ময়দানে! আমি আনমনে আখরোটের ছোট্ট একটা ডাল ভেঙে কাছের দেবদারু গাছ থেকে কতকগুলো ঝুম্‌কো ফুল পেড়ে হেনার পায়ের কাছে ফেলে দিলুম!

শুাম্বুলী-সুর্‌মা-মাখা তার কালো আঁখির পাতা ঝ'রে দু' ফোটা অশ্রু গড়িয়ে প'ড়ল! তার মেহেদী-ছোবানো হাতের চেয়েও লাল হ'য়ে উঠেছিল তার মুখটা!

একটা কাঁচা মনক্কার থোকা ছিঁড়ে নিয়ে অদূরের কেয়া-ঝোপের বুল্‌বুলিটার দিকে ছুড়ে দিলুম। সে গান বন্ধ ক'রে উড়ে গেল।

মানুষ যেটা ভাবে সব চেয়ে কাছে, সেইটাই হ'চ্ছে সব চেয়ে দূর! এ একটা মস্ত বড় প্রহেলিকা!

হেনা—হেনা! . . . আফ্‌সোস্‌!

হিণ্ডেনবার্গ লাইন

ওঃ! আবার কোথা এসেছি! এটা যে একটা পাতালপুরী, দেও আর পরীদের রাজ্যি, তা' কিছুতেই বিশ্বাস ক'রতে পারছিনে! যুদ্ধের ট্রেঞ্চ্ যে একটা বড় শহরের মত এ রকম ঘর-বাড়ীওয়ালা হবে, তা' কি কেউ অনুমান ক'রতে পেরেছিল? জমিনের এত নীচে কি বিরাট্ কাণ্ড! এও একটা পৃথিবীর মস্ত বড় আশ্চর্য্য। দিব্যি বাঙ্লার নওয়াবের মত থাকা যাচ্ছে কিন্তু এখানে! . . .

এ শান্তির জন্যে তো আসি নি এখানে! আমি তো সুখ চাই নি। আমি চেয়েছি শুধু ক্লেশ শুধু ব্যথা শুধু আঘাত! এ আরামের জীবনে আমার পোষাবে না বাপু! তা' হ'লে আমাকে অন্য পথ দেখ্তে হবে। এ যেন ঠিক "টকের ভয়ে পালিয়ে এসে তেঁতুল-তলায় বাসা!"

উঁহুঁ,—আমি কাজ চাই! নিজেকে ডুবিয়ে রাখ্তে চাই। এ কি অস্বস্তির আরাম!

আচ্ছা, আগুনে পুড়ে নাকি লোহাও ইস্পাত হ'য়ে যায়। মানুষ কি হয়? শুধু 'ব্যাপ্টাইজ্ড্'?

আবার মনটা ছাড়া পেয়ে আমার সেই আঙুর আর বেদানা গাছে ভরা ঘরটায় দৌড় মেরেছে! আবার মনে প'ড়ছে সেই কথা! . . .

"হেনা, আমি যাচ্ছি মুক্ত দেশের আগুনে ঝাঁপিয়ে প'ড়তে। যার ভিতরে আগুন, আমি চাই তার বাইরেও আগুন

জ্বলুক ! আর হয়তো আস্‌ব না। তবে আমার সম্বল কি ? পাথেয় কই ? আমি কি নিয়ে সেই অচিন দেশে থাক্‌ব ?

আমার হাতের মুঠোয় হেনার হেনারঞ্জিত হাত দু'টী কিশলয়ের মত কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ল ? সে স্পষ্টই ব'ললে,— "এ তো তোমার জীবনের সার্থকতা নয় সোহ্‌রাব ! এ তোমার রক্তের উষ্ণতা ! এ কি মিথ্যাকে আঁক্‌ড়ে ধ'রতে যাচ্ছ ! এখনও বোঝ ! . . . আমি আজও তোমায় ভালবাস্‌তে পারিনি !"

সব খালি ! সব শূন্য ! খাঁ—খাঁ—খাঁ ! একটা জোর দম্‌কা বাতাস ঘন ঝাউ গাছে বাধা পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল,— আঃ আঃ—আঃ !

যখন কোয়েটা থেকে আমাদের ১২৭ নম্বর বেলুচি রেজিমেণ্টের প্রথম 'ব্যাট্যালিয়ান' যাত্রা ক'রলে এই দেশে আস্‌বার জন্যে, তখন আমার বন্ধু এক জন যুবক বাঙালী ডাক্তার সেব গাছের তলায় ব'সে গাচ্ছিল,—

"এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে,
বিদায় ক'রেছ যারে নয়ন-জলে।
আজি মধু সমীরণে
নিশীথে কুসুম-বনে,
তারে কি প'ড়েছে মনে বকুল-তলে।
এখন ফিরাবে হায় কিসের ছলে !
মধুনিশি পূর্ণিমার
ফিরে আসে বার বার,
সে জন ফিরে না আর যে গেছে চ'লে !
এখন ফিরাবে আর কিসের ছলে !"

কি দুর্ব্বল আমি। সাধে কি আস্তে চাইনি এখানে! ওগো, এ রকম নওয়াবী-জীবনে আমার চ'লবে না!

আমার রেজিমেণ্টের লোকগুলো মনে করে আমার মত এত মুক্ত, এত সুখী আর নেই। কারণ আমি বড্ডো বেশী হাসি। হায়, মেহেদী পাতার সবুজ বুকে যে কত 'খুন' লুকানো থাকে, কে তার খবর নেয়!

আমি পিয়ানোতে "হোম হোম সুঈট্ সুইট্ হোম" গৎটা বাজিয়ে সুন্দর রূপে গাইলুম দেখে ফরাসীরা অবাক্ হ'য়ে গেছে, যেন আমরা মানুষই নই, ওদের মত কোন কাজ করা যেন আমাদের পক্ষে এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার! এ ভুল কিন্তু ভাঙাতেই হবে।

হিণ্ডেনবার্গ লাইন

কি করি, কাজ না থাক্‌লেও আমায় কাজ খুঁজে নিতে হয়! কাল রাত্তিরে প্রায় দু' মাইল শুধু হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে ওদের অনেক তার কেটে দিয়ে এসেছি। কেউ এতটুকু টের পায় নি।

আমাদের 'কমাণ্ডিং অফিসার' সাহেব ব'লেছেন,—"তুম কো বাহাদুরী মিল যায়েগা।"

আজ আমি 'হাবিলদার' হ'লুম।

এ মন্দ খেলা নয় তো!

আবার সেই বিদেশিনীর সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল! এই দু' বছরে কত বেশী সুন্দর হ'য়ে গেছে সে! সে দিন সে সোজা-

স্নুজি ব'ললে, যে, (যদি আমার আপত্তি না থাকে) সে আমায় তার সঙ্গী-রূপে পেতে চায়! আমি ব'ললুম,—"না, তা' হ'তেই পারে না।"

মনে মনে ব'ললুম,—"অন্ধের লাঠি একবার হারায়।' আবার? আর না! যা ঘা খেয়েছি, তাই সাম্‌লানো দায়!"

বিদেশিনীর নাল চোখ দু'টো যে কি রকম জলে ভ'রে উঠেছিল, আর বুকটা তার কি রকম ফুলে ফুলে উঠেছিল, তা' আমার মত পাষাণকেও কাঁদিয়েছিল!

তার পর সে নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে ব'ললে,—"তবে আমাকে ভালবাসতে দেবে তো? অন্ততঃ ভাই-এর মত…"

আমি বেওয়ারিশ মাল। অতএব খুব আগ্রহ দেখিয়ে ব'ললুম,—"নিশ্চয়, নিশ্চয়!" তার পর তার ভাষায় 'অডিএ' (বিদায়!) ব'লে সে যে সেই গিয়েছে, আর আসেনি! আমার শুধু মনে হ'চ্ছে,—সে জন ফিরে না আর যে গেছে চ'লে! . . . . ওঃ—

যা হ'ক্, আজ গুর্খাদের পেয়ে বেশ থাকা গেছে কিন্তু। গুর্খাগুলো এখনো যেন এক-একটা শিশু। দুনিয়ার মানুষ যে এত সরল হ'তে পারে, তা' আমার বিশ্বাসই ছিল না। এই গুর্খা আর তাদের ভায়রা-ভাই 'গাড়োয়াল', এই দু'টো জাতই আবার যুদ্ধের সময় কি রকম ভীষণ হ'য়ে ওঠে! তখন এদের প্রত্যেকে যেন এক-একটা 'শেরে বব্বর'! এদের 'খুক্‌রী' দেখলে এখনও জর্ম্মানরা রাইফ্‌ল্‌ ছেড়ে পালায়। এই দু'টো জাত যদি না থাক্‌ত, তা হ'লে আজ এত দূর এগুতে পারতুম না আমরা। তাদের মাত্র কয় জন আর বেঁচে আছে। রেজিমেণ্টকে রেজিমেণ্ট

একেবারে সাবাড়! অথচ যে দু' চার জন বেঁচে আছে, তারাই কি রকম হাস্‌ছে খেল্‌ছে। যেন কিছুই হয় নি!

ওরা যে মস্ত একটা কাজ ক'রেছে, এইটেই কেউ এখনো ওদের বুঝিয়ে উঠ্‌তে পারে নি! আর ঐ অত লম্বা চওড়া শিখগুলো, তারা কি বিশ্বাসঘাতকতাই না ক'রেছে! নিজের হাতে নিজে গুলি মেরে হাঁসপাতালে গিয়েছে।

বাহবা! ট্রেঞ্চের ভিতর একটা ব্যাটালিয়ন্‌ 'মার্চ্চ' হ'চ্ছে! ফ্রান্সের মধুর ব্যাণ্ডের তালে তালে কি সুন্দর পা'গুলো প'ড়ছে আমাদের! লেফ্‌ট্‌—রাইট্‌—লেফ্‌ট্‌! ঝপ্‌—ঝপ্‌—ঝপ্‌। এই হাজার লোকের পা এক সঙ্গেই উঠ্‌ছে, এক সঙ্গেই প'ড়ছে! কি সুন্দর!

বেলুচিস্তান

কোয়েটার দ্রাক্ষাকুঞ্জাস্থিত

আমার ছোট্ট কুটির

এ কি হ'ল? আজ এই আখ্‌রোট আর নাশ্‌পাতির বাগানে ব'সে ব'সে তাই ভাবছি!

আমাদের সব ভারতীয় সৈন্য দেশে ফিরে এল, আমিও এলুম। কিন্তু সে দু'টো বছর কি সুখেই কেটেছে।

আজ এই স্বচ্ছ নীল একটু-আগে-বৃষ্টির-জলে-ধোওয়া আসমানটী দেখ্‌ছি, আর মনে প'ড়ছে সেই ফরাসী তরুণীটার ফাঁক ফাঁক নীল চোখ দু'টী। পাহাড়ে ঐ চমরী মৃগ দেখে তার সেই থোকা থোকা কোঁকড়ান রেশমী চুলগুলো মনে প'ড়ছে। আর ঐ যে পাকা আঙুর ঢল্ ঢল্ ক'রছে, অমনি স্বচ্ছ তার চোখের জল।

আমি 'আফসার' হ'য়ে 'সর্দ্দার বাহাদুর' খেতাব পেলুম। সাহেব আমায় কিছুতেই ছাড়বে না। হায়, কে বুঝবে আর কা'কেই বা বোঝাব, ওগো আমি বাঁধন কিনতে আসি নি। সিন্ধুপারে কোন মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েও যাই নি। ও শুধু নিজেকে পুড়িয়ে খাঁটি ক'রে নিতে,—নিজেকে চাপা দিতে।

আবার এইখানটাতেই, যেখানে কখনও আসব না মনে ক'রেছিলুম, আসতে হ'ল। এ কি নাড়ীর টান!

আমার কেউ নেই, কিছু নেই, তবু কেন র'য়ে র'য়ে মনে হ'চ্ছে,—না, এইখানেই সব আছে। এ কার মূঢ় অন্ধ সান্ত্বনা?

কারুর কিচ্ছু করিনি, আমারও কেউ কিচ্ছু করে নি, তবে কেন এখানে আসছিলুম না? সে একটা অব্যক্ত বেদনার অভিমান,—সেটা প্রকাশ ক'রতে পার্‌ছি নে!

হেনা!—হেনা! সাবাস্! কেউ কোথাও নেই; তবুও ও-ধার থেকে বাতাসে ভেসে আস্‌ছে ও কি শব্দ,—"না—না—না।"

পাহাড় কেটে নিঝরটা তেমনি বইছে, কেবল যার মেহেদী-রঙানো পদ-রেখা এখনও ওর পাথরের বুকে লেখা

র'য়েছে, সেই হেনা আর নেই ! এখানে ছোট খাটো কত জিনিস প'ড়ে র'য়েছে, যাতে তার কোমল হাতের ছোঁওয়ার গন্ধ এখনও পাচ্ছি।

হেনা ! হেনা ! হেনা ! . . . আবার প্রতিধ্বনি, নাঃ—নাঃ—নাঃ !

* * *

পেশোয়ার

পেয়েছি, পেয়েছি ! আজ তার দেখা পেয়েছি ! হেনা ! হেনা ! তোমাকে আজ দেখেছি এইখানে, এই পেশোয়ারে !

তবে কেন মিথ্যা দিয়ে এত বড় একটা সত্যকে এখনও ঢেকে রেখেছ ?

সে আমায় লুকিয়ে দেখেছে আর কেঁদেছে। . . .

কিছু বলেনি, শুধু চেয়ে চেয়ে দেখেছে আর কেঁদেছে ? . . .

এ রকম দেখায় যে অশ্রু প্রাণের শ্রেষ্ঠ ভাষা। সে আজও ব'ললে,—সে আমায় ভালবাসতে পারেনি।

ঐ 'না' কথাটা ব'লবার সময়, সে কি করুণ একটা কান্না তার গলা থেকে বেরিয়ে ভোরের বাতাসটাকে ব্যথিয়ে তুলেছিল !

দুনিয়ার সব চেয়ে মস্ত হেঁয়ালী হ'চ্ছে—মেয়েদের মন !

কাবুল

ডাক্কা ক্যাম্প

যখন মানুষের মত মানুষ আমীর হাবিবুল্লাহ্ খাঁ শহীদ্ হ'য়েছেন শুন্‌লুম, তখন আমার মনে হ'ল এত দিনে হিন্দুকুশের চূড়াটা ভেঙে প'ড়ল! সুলেমান পর্ব্বত জড়শুদ্ধ উখ্‌ড়িয়ে গেল!

ভাব্‌তে লাগ্‌লুম, আমার কি করা উচিত? দশ দিন ধ'রে ভাবলুম। বড্ডো শক্ত কথা।

নাঃ, আমীরের হ'য়ে যুদ্ধ করাই ঠিক মনে ক'রলুম। কেন? এ 'কেন'র উত্তর নেই। তবু আমি সরল মনে বলছি, ইংরেজ আমার শত্রু নয়। সে আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু। যদি বলি, আমার এবার এ যুদ্ধে আসার কারণ, একটা দুর্ব্বলকে রক্ষা ক'রবার জন্যে প্রাণ আহুতি দেওয়া, তা হ'লেও ঠিক উত্তর হয় না!

আমার অনেক খামখেয়ালীর অর্থ আমি নিজেই বুঝি না!

সে দিন ভোরে ডালিম ফুলের গায়ে কে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল! ওঃ, সে যেন আমারই মত আরও অনেকের বুকের খুন-খারাবী! . . .

উদার আকাশটা কেঁদে কেঁদে একটুর জন্যে থেমেছে! তার চোখটা এখনও খুব ঘোলা, আবার সে কাঁদ্‌বে! কার সে বিয়োগ-ব্যথায় বিধুর কোয়েলীটাও কেঁদে কেঁদে চোখ লাল করঞ্জ্ ক'রে ফেলেছিল, আর তার "উহু উহু" শব্দ প্রভাতের ভিজা বাতাসে টোল খাইয়ে দিচ্ছিল! শুক্‌নো নদীটার ও-পারে ব'সে কে শানাইতে আশোয়ারী রাগিণী ভাঁজছিল! তার মীড়ে মীড়ে

কত যে চাপা হৃদয়ের কান্না কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছিল, তা সব চেয়ে বেশী বুঝ্‌ছিলুম আমি। মেহেদী ফুলের তীব্র গন্ধে আমাকে মাতাল ক'রে তুলেছিল!

আমি ব'ললুম,—হেনা, আমীরের হ'য়ে যুদ্ধে যাচ্ছি। আর ফিরে আস্‌ব না। বাঁচ্‌লেও আস্‌ব না।

সে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে ব'ললে,—"সোহ্‌রাব—প্রিয়তম! তাই যাও! আজ যে আমার ব'লবার সময় হ'য়েছে, তোমায় কত ভালবাসি!—আজ আর আমার অন্তরের সত্যিকে মিথ্যা দিয়ে ঢেকে 'আশেক'কে কষ্ট দেব না! . . .

আমি বুঝ্‌লুম, সে বীরাঙ্গনা—আফগানের মেয়ে। যদিও আফগান হ'য়েও আমি শুধু পরদেশীর জীবন যাপন ক'রেই বেড়িয়েছি, তবু এখন নিজের দেশের পায়ে আমার জীবনটা উৎসর্গ করি, এই সে চাচ্ছিল।

ওঃ, রমণী তুমি! কি ক'রে তবে নিজেকে এমন ক'রে চাপা দিয়ে রেখেছিলে হেনা?

কি অটল ধৈর্য্যশক্তি তোমার! কোমলপ্রাণা রমণী সময়ে কত কঠিন হ'তে পারে! . . .

কাবুল

পাঁচ পাঁচটা গুলি এখনও আমার দেহে ঢুকে র'য়েছে! যতক্ষণ না সম্পূর্ণ জ্ঞান হারিয়েছিলুম, তত ক্ষণ সৈন্যদের কি শক্ত ক'রেই রেখেছিলুম!

খোদা, আমার বুকের রক্তে আমার দেশকে রক্ষা ক'রেছি,

একে যদি 'শহীদ' হওয়া বলে, তবে আমি 'শহীদ' হ'য়েছি। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমি আমার কর্ত্তব্য পালন ক'রেছি!

আমি চ'লে এলুম। হেনা ছায়ার মত আমার পিছু পিছু ছুটল! এত ভালবাসা, পাহাড়-ফাটা উদ্দাম জলস্রোতের মত এত প্রেম কি ক'রে বুকের পাঁজর দিয়ে আট্‌কে রেখেছিলে হেনা? . . .

আমীর তাঁর ঘরে আমার আসন দিয়েছেন। আজ আমি তাঁর সেনাদলের এক জন সর্দ্দার!

আর হেনা? হেনা!—ঐ যে সে আমায় আঁক্‌ড়ে ধ'রে ঘুমিয়ে প'ড়েছে। . . . এখনও তার বুক কিসের ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে! এখনও বাতাস ছাপিয়ে তার নিশ্বাসে উঠ্‌ছে একটা মস্ত অতৃপ্তির বেদনা!

আহা, আমার মত অভাগাও বড্ডো বেশী জখম হ'য়েছে! —ঘুমিয়েছে, ঘুমুক!—না, না, তুই জনেই ঘুমুব! এত বড় তৃপ্তির ঘুম থেকে জাগিয়ে আর বেদনা দিও না খোদা!

হেনা! হেনা!—না—না—আঃ! . . .

বাদল-বরিষণে

* * *

এ কোন্ শ্যামলী পরী পূবের পরীস্থানে কেঁদে কেঁদে যায়—
নবোদ্ভিন্ন কুঁড়ি-কদম্বের ঘন যৌবন-ব্যথায়!
জেগেছে বালার বুকে এক বুক ব্যথা আর কথা,
কথা শুধু প্রাণে কাঁদে,
ব্যথা শুধু বুকে বেঁধে, মুখে ফোটে শুধু আকুলতা!

* * *

ঝিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম রিমি রিমি রিম্ ঝিম্
বাজে পাঁইজোর—
কে তুমি পূরবী বালা? আর যেন নাহি পাই জোর
চলা-পায়ে মোর, ও-বাজা আমারো বুকে বাজে!
ঝিল্লীর ঝিমানী-ঝিনি-ঝিনি
শুনি যেন মোর প্রতি রক্তবিন্দু মাঝে!
আমি ঝড়? ঝড় আমি? না না আমি বাদলের বায়!
বন্ধু! ঝড় নাই।"

—কল্লোল—

* * *

বাদল-বরিষণে

[এক নিমেষের চেনা]

বৃষ্টির ঝম্-ঝমানী শুনতে শুনতে সহসা আমার মনে হ'ল, আমার বেদনা এই বর্ষার সুরে বাঁধা! . .

সাম্‌নে আমার গভীর বন! সেই বনে ময়ূরে পেখম ধ'রেছে, মাথার ওপর বলাকা উড়ে যাচ্ছে, ফোটা কদম ফুলে কা'র শিহরণ কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ছে, আর কিসের ঘন-মাতাল-করা সুরভিতে নেশা হ'য়ে সারা বনের গা ট'লছে! . . .

এটা শ্রাবণ মাস, না?—আহা, তাই অন্তরে আমার বরিষণের ব্যথাটুকু ঘনিয়ে আসছে!

সে হ'ল আজ তিন বছরের কথা। আমার এই খাপছাড়া জীবনে তার স্মৃতিগুলো ঝড়ের মুখে পল্লবনের মত ছিন্ন-ভিন্ন হ'য়ে গেছে! কখনো তা'র একটা কথা মনে পড়ে, কখনো আধখানি ছোঁওয়া আমার দাগা-পাওয়া বুকে জাগে! মানস-বনের যুঁই-কুঁড়ি আমার ফুটতে গিয়ে ফুটতে পায় না, শিউলির বোঁটা শিথিল হ'য়ে যায়! ওরই সাথে এই শাঙন-ঘন দেয়া-গরজনে আর এক দিনের অমনি মেঘের ডাক মনে পড়ে, আর আঁখি আমার আপনি জলে ভ'রে ওঠে!

সে দিন ছিল আজকার মতই শ্রাবণের শুক্লা পঞ্চমী।

পথ-হারা আমি ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে যে দিন প্রথম এই কালিঞ্জরে এসে পড়ি, সে দিন এখানে কাজ্‌রী উৎসবের মহা ধুম প'ড়ে গেছে! আকাশ-ভরা হাল্‌কা জ'লো মেঘ আমারই মত খাপ্‌ছাড়া হ'য়ে যেন অকূল আকাশে কূল হারিয়ে ফিরছিল। তারই ঈষৎ ফাঁকে সুনীল গগনের এক ফালি নীলিমা যেন কোন্‌ অনন্ত-কান্নারত-প্রেয়সীর কাজল-মাখা কালো চোখের রেখার মত করুণ হ'য়ে জাগছিল! পথ-চলার নিবিড় শ্রান্তি নিয়ে কালিঞ্জরের উপকণ্ঠের বাঁকে উপবনের পাশে তার সাথে আমার প্রথম দেখা। এই হঠাৎ-দেখাতেই কেন আমার মনে হ'ল, এ-মুখ যে আমার কত কালের চেনা—কোথায় যেন এঁকে হারিয়েছিলাম। সেও আমার পানে চেয়ে আমার চাওয়ায় কি দেখতে পেলে সেই জানে,—তাই পথ চ'লতে চ'লতে তার হাতের কচি ধানের ছোট্ট গোছাটী মুখের ওপর আধ-আড়াল ক'রে আমায় জিজ্ঞেস্‌ ক'রলে,—পরদেশীয়া রে, তুহার দেশ কাঁহা?

সে স্বর আমার বাইরে ভিতরে এক ব্যাকুল রোমাঞ্চ দিয়ে গেল, বুকের সমস্ত রক্ত আকুল আবেগে কেঁপে কেঁপে নৃত্য ক'রে উঠ্‌ল!

এ কোন্‌ চির-পরিচিত স্বর। এ কে ছলনা করে আমায়? পূবের হাওয়া আমার পাশ দিয়ে কেঁদে গেল— "হায় গৃহহীন, হায় পথহারা!" ঝড়ে-ওড়া এক দল পল্‌কা মেঘের মত মল্লারের সুরে পথের আকাশ-বাতাস ভরিয়ে কাজ্‌রী গায়িকা রূপসীরা গেয়ে যাচ্ছিল,—ঘুঙ্‌ ঘট-পট খোলো আরে সাঁবলিয়া! —ওগো শ্যামল, এখন তোমার ঘোম্‌টা খুলে ফেল!

আমার কাছে তা'কে এমন ক'রে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখে তরুণীরা আঁখির পলকে থ'ম্‌কে দাঁড়াল, তার পর চুল ছড়িয়ে বাহু দুলিয়ে আঁচল উড়িয়ে ব'লে উঠ্‌ল,—"কাজ্‌রীয়া গো! ক্যা তোরি সাঁবলিয়া আ গয়ি ?"

সে তাদের এক পাশে স'রে গিয়ে কাঁপা-গলায় ব'ললে,— "নহি রে সজ্‌নিয়া, নহি ! য়্যে পর্‌দেশী জোয়ান্ . , .

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আর এক জন ব'লে উঠ্‌ল,—"ক্যা তেরি দিল্ ছিন্ লিয়া ?"

সে লজ্জায় আর দাঁড়াতে পার্‌ল না, খাম্‌খা আমার দিকে অনুযোগ-তিরস্কার-ভরা বাঁকা চাউনী হেনে চ'লে গেল !

পথের ঐ বাঁক থেকেই অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছিল তাদের ধানী রঙ্-এর শাড়ীর ঢেউ, আর আস্‌মানী রঙ্-এর ওড়্‌নার আকুল প্রান্ত। র'য়ে-র'য়ে তাদের এলানো কেশপাশ বেয়ে কেমন মধুর এক সোঁদা-গন্ধ ভেসে আস্‌ছিল। অতগুলি সুন্দর মুখের মাঝ থেকে আমার মনে জগ্ জগ্ ক'রছিল শুধু ঐ কাজ্‌রিয়ার ছোট কালো মুখ,—যা শিল্পীর হাতের কালো-পাথর-কোঁদা দেবীমুখের মত নিটোল। বিজ্‌লী-চমকের মত তার ঐ যে একটা দুরন্ত চপল গতি, তারই মধুরতাটুকু আমার মনের মেঘে বারে-বারে তড়িৎ হেনে যাচ্ছিল।

পথের পাশের দোল্‌না-বাঁধা দেবদারু-তলায় দাঁড়িয়ে আমার শুধু এই কথাটাই মনে হ'তে লাগ্‌ল, এই এক পলকের আধখান চাওয়ায় কেমন ক'রে মানুষ এত চির-পরিচিত হ'য়ে যেতে পারে।

* * *

[অভিমানের দেখা-শোনা]

তার পরের দিন আমলকী বনে দাঁড়িয়ে সেই আগেকার দিনের কথাটাই ভাব্‌ছিলাম,—আচ্ছা, এই যে আমার মানসী বঁধু—একে কবে কোন্ পূরবীর কান্না-ভরা-খেয়ার-পারে হারিয়ে এসেছিলাম? সকল স্মৃতি ওলট-পালট ক'রেও তার দিন ক্ষণ মনে আসি-আসি ক'রেও যেন আসে না, অথচ মনের-মানুষ-আমার একে দেখেই কেমন ক'রে চিনে ফেল্‌লে। তাই সে আমার আঁখির দীপ্তিতে ফুটে উঠে ব'লে উঠল,—এই তো আমার চির-জনমের চাওয়া তুমি! ওগো, এই তো আমার চির-সাধনার ধন তুমি!

আর একবার আমার স্মৃতির অতল তলে ডুব দিলাম, এমন সময় ঝড়ের সুরে কাজ্‌রী গান গাইতে গাইতে রূপসী নাগরীরা আমার পাশ বেয়ে উধাও হ'য়ে গেল,—

"চঢ়ে ঘটা ঘন ঘোর গরজ রহে বদরা রে হোরি।
রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ পানি বরষৈ রহি রহি জিয়া ঘাবরাবৈ রামা
বহৈ নয়নাসে নীর ময়েল্ ভয়ি কজ্‌রা রে হোরি।"

[ঘোর ঘটা ক'রে গগনে মেঘ ক'রেছে, বাদল গরজন ক'রছে, রিম্-ঝিম্ রিম্-ঝিম বৃষ্টি ঝ'রছে, থেকে থেকে জান আমার ঘাবরিয়ে উঠ্‌ছে, নয়ন বেয়ে আঁসু ঝ'রছে,—ওগো, চোখের কাজল আমার মলিন হ'য়ে গেল!]

বর্ষার মেঘ চ'লে গেল। মর্ম্মে আমার তারই গাঢ় গমক গুম্‌রে ফির্‌তে লাগ্‌ল,—"ময়েল ভয়ি কজ্‌রা রে হোরি!" —ওগো প্রিয়, চোখের কাজল আমার মলিন হ'য়ে গেল! সে কোন্ অচেনার উদ্দেশে এ অবুঝ-কান্না তোমার,

ওগো বিদেশিনী? সে-কথা সেও জানে না, তা'র মনও জানে না! . . .

আবার সেই সন্তাপহারী আমার চিরবাঞ্ছিত মেঘ গুরু-গর-জনে ডেকে উঠ্‌ল! বনের সিক্ত আকাশকে ব্যথিয়ে ময়ূরের কেকা-ধ্বনির সাথে চাতকের অতৃপ্তির কাঁদন রণিয়ে রণিয়ে উঠ্‌ছিল,—দে জল, দে জল! হায় রে চিরদিনের শাশ্বত পিয়াসী! তোর এ অনন্ত পিয়াসা কি সারা সাগরের জলেও মিট্‌ল না?

আমার কেমন আব্‌ছা এক কণা স্মৃতি মনের কানে ব'লছিল,—তুমি আগে এমনই চাতক ছিলে, তোমার পিপাসা মিটবার নয়!

ভেজা মাটীর আর খস্‌-খস্‌-এর গুমোট-ভরা ভারী গন্ধে যেন দম আট্‌কে যাচ্ছিল; ও-ধারে ফোটা কেয়া ফুলের, আধ-ফোটা যুথির, বেলীর কুঁড়ির, ঝরা শেফালি-বকুলের দিল্‌-মাতানো খোশ্‌বুর মাঝে মাঝে পদ্ম আর কদম্বের স্নিগ্ধ সুরভি মধুর আমেজ দিচ্ছিল! বর্ষার ব্যথা আমার দিকে গভীর মৌন চাওয়া চেয়ে শুধাচ্ছিল,—

"এমন দিনে তারে বলা যায়, এমন ঘন ঘোর বরিষায়!"

হায়, কি বলা যায়? কাকে বলা যায়? এ উতল-পাগল তার কিছুই জানে না, অথচ সে কি যেন বলতে চায়—কা'কে যেন বুকের কাছে পেতে চায়! এই মেঘদূত তার কাছে তার পালিয়ে-যাওয়া প্রিয়তমার সন্ধান ক'রে গেছে, তাই সেই চাওয়া-পাওয়া-টুকুর বার্ত্তা পৌঁছিয়ে দিয়ে গেছে, তাই সে মেঘদূতকে অভিনন্দন জানাচ্ছে,—

"এস হে সজল ঘন বাদল বরিষণে!"

আজ আর একবার মনে হ'ল সে তার বিদায়ের দিনে ব'লেছিল,—আবার দেখা হবে, তখন হয়তো তুমি চিন্‌তে পারবে না!

আজ সেই বিদায়-বাণী মনে প'ড়ে আমার বক্ষ কান্নায় ভ'রে উঠ্‌ছে! আমার পাশ দিয়ে কালো কাজরিয়া যখন তার চাউনী হেনে চ'লে গেল, তখন ঐ কথাটাই বারে বারে মনে প'ড়ছিল,—হয়তো তুমি চিন্‌তে পার্‌বে না!

তাই কাজ্‌রিয়াকে ডেকে ব'ললাম,—এই তো তোমায় চিন্‌তে পেরেছি তোমার এই চোখের চাওয়ায়!

কাজ্‌রিয়া চুল দিয়ে মুখ ঝেঁপে চ'লে গেল! তা'র ঐ না-চাওয়াই ব'লে গেল, সেও আমায় চিন্‌তে পেরেছে। . . .

আবার অনুসন্ধানে বেরিয়ে প'ড়লাম। ঝঞ্ঝার উতরোলের মত দোল খেয়ে খেয়ে পাশের উপবন হ'তে তরুণী কণ্ঠের মল্লার হিন্দোলা ভেসে আসছিল,—মেঘবা ঘুম্ ঘুম্ বরষাবৈ ছাবৈ বদরিয়া শাঙন মে!

পথের মাঝে দাঁড়িয়ে দেখলাম, আকাশ বেয়ে হাজার পাগলা-ঝোরা ঝ'র্‌চে—ঝম্ ঝম্ ঝম্! যেন আকাশের আঙিনায় হাজার হাজার দুষ্টু মেয়ে কাঁকর-ভরা মল বাজিয়ে ছুটোছুটি ক'রছে! তপোবনে গিয়ে দেখলাম, সেই বৃষ্টিধারায় ভিজে ভিজে মহা উৎসাহে বিদেশিনী তরুণীরা দেবদারু ও বকুল শাখায় ঝুলানো দোল্‌নায় দোল্ খেয়ে খেয়ে কাজ্‌রী গাইছে। ঝড়-বৃষ্টির সাথে সে কি মাতামাতি তাদের! আজ তা'দের

কোথাও বন্ধন নেই, ওদের প্রত্যেকেই যেন এক একটা পাগলিনী প্রকৃতি ! কি সুন্দর সেই প্রকৃতির উদ্দাম চঞ্চলতার সনে মানব-মনের আদিম চির-যৌবনের বন্ধ-হারা গতি-রাগের মিলন !—শাঙন মেঘের জমাট সুরে আমার মনের বীণায় মূর্চ্ছনা লাগ্‌ল। আমার যৌবন-জোয়ারও অমনি ঢেউ খেলে উঠ্‌ল। মনের পাগল অম্‌নি ক'রে দোদুল দোলায় দুলে সুন্দরীদের এলো চুলের মতই হাওয়ার বেগে মেঘের দিকে ছুট্‌ল,—হায় কোথায়, কোন্ সুদূরে তার সীমা-রেখা !

হিন্দোলার কিশোরীরা গাচ্ছিল কাজল-মেঘের আর নীল আকাশের গান। নীচে শ্যামল দূর্ব্বায় দাঁড়িয়ে বিনুনী-বেণী-দোলানো সুন্দরীরা মৃদঙ্গে তাল দিয়ে গাচ্ছিল কচি ঘাসের আর সবুজ ধানের গান। তাদের প্রাণে মেঘের কথার ছোঁওয়া লেগেছিল ! . . . মেঘের এই মহোৎসব দেখে আপনি আমার চোখে জল ঘনিয়ে এল। দেখ্‌লাম সেই কালো কাজ্‌রিয়া—দোল্‌না ছেড়ে আমার পানে সজল চোখের চেনা চাউনী নিয়ে চেয়ে আছে। আমার চোখে চোখ প'ড়তেই সে এক নিমিষে দোল্‌নায় উঠে ক'য়ে উঠ্‌লো,—সজনিয়া গে, ওহি সুন্দর পরদেশিয়া ! তার সই মতিয়া দুল্‌তে দুল্‌তে বাদল-ধারায় এক রাশ হাসি ছড়িয়ে দিয়ে ব'ল্‌ল,—হা রে কাজ্‌রিয়া, তুহার সাঁবলিয়া !

কাজ্‌রিয়া মতিয়ার চুল ধ'রে টেনে ফেলে দিয়ে পাশের বকুল গাছটার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল !

আমি ভাব্‌ছিলাম, এম্‌নি ক'রেই বুঝি মেঘে আর মানুষে কথা কওয়া যায় ! এম্‌নি ক'রেই বুঝি ও-পারের বিরহী বন্ধ

মেঘকে দূতী ক'রে তার বিচ্ছেদ-বিধুরা প্রিয়তমাকে বুকের ব্যথা জানাত! আমার ভেজা-মন তাই কালো মেঘকে বন্ধু ব'লে নিবিড় আলিঙ্গন ক'রলে!

চ'ম্‌কে চেয়ে দেখ্‌লাম, সে কখন্ এসে আমার পাশে দাঁড়িয়েছে। তার গভীর অপলক দৃষ্টি মেঘ পারিয়ে কোন্ অনন্তের দিগ্বলয়ে পৌঁছেছিল, সেই জানে। তার পাশে থেকে আমারও মনে হ'ল ঐ দূর মেঘের কোলে গিয়ে দাঁড়িয়েছি শুধু সে আর আমি। কেউ কোথাও নেই, উপরে নীচে আশে পাশে শুধু মেঘ আর মেঘ,—সেই অনন্ত মেঘের মাঝে সে মেঘের বরণ বাহু দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধ'রে তার মেঘলা-দৃষ্টিখানি আমার মুখের উপর তুলে ধ'রেছে! ঐখানেই—ঐ চেনা-শোনা জায়গাটীতেই যেন আমাদের প্রথম দেখা-শুনা, ঐ খানেই আবার আমাদের অভিমানের ছাড়াছাড়ি, এই কথাটা আমাদের দুই জনেরই মনের অচিন্ কোণে ফুটে উঠ্‌তেই আমরা একান্ত আপনার হ'য়ে গেলাম। যে কথাটী হয়তো সারা জীবন চোখের জলে ভেসেও বলা হ'ত না, এই ঝড়-বৃষ্টির মাঝখানে দাঁড়িয়ে এক নিমিষে চারটী চোখের অনিমিখ চাউনীতে তা' কওয়া হ'য়ে গেল! . . .

আমি ব'ললাম,—কাজ্‌রি, আমি অনেক জীবনের খোঁজার পর তোমায় পেয়েছি! এই মেঘের ঝরায় যে প্রাণের কথা প্রাণ দিয়ে সে শুন্‌ছিল, সহসা তা'তে বাধা পেয়ে সে সচেতন হ'য়ে উঠ্‌ল। চখা হরিণীর মত ভীত ত্রস্ত চাউনী দিয়ে সে চারিদিকে চেয়ে আচম্‌কা আর্ত্ত আকুল স্বরে সে কেঁদে উঠ্‌ল! আর দাঁড়াল না, হু'ক্‌রে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বিদায় নিলে!

যেতে যেতে ব'লে গেল,—নহি রে সুন্দর পরদেশী, ময় কারী কাজ্‌রিয়া হুঁ! (ওগো সুন্দর বিদেশী, আমি কালো!) আরো কি ব'লতে ব'লতে অভিমানে ক্ষোভে তার মুখে আর কথা ফুট্‌ল না, কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে এল!

একটী পূরো বছর আর তার দেখা পাই নি! . . .

আজ শাওন রাতের মাতামাতিতে হৃদয় আমার কথায় আর ব্যথায় ভ'রে উঠেছে, আর তার সেই বিদায়-দিনের আরও অনেক কিছু মনে প'ড়ছে! আজ আমার শিয়রের ক্ষীণ দীপ-শিখাটীতে বাদল-বায়ের রেশ লেগে তাকে কাঁপিয়ে তুল্‌ছে, আমার বিজন কক্ষটীতে সেই কাঁপুনী আমার মনে পড়িয়ে দিচ্ছে,—হায়, আজ তেমন ক'রে আঘাত দেবারও আমার কেউ নেই! প্রিয়তমের কাছ থেকে আঘাত পাওয়াতে যে কত নিবিড় মাধুরী, তা বেদনাতুর ছাড়া কে বুঝ্‌বে? যার নিজের বুকে বেদনা বাজেনি, সে পরের বেদন্ বুঝ্‌বে না, বুঝ্‌বে না!

সে ব'লেছিল,—দেখ বিদেশী পথিক! আমি নিবিড় কালো, লোকে তাই আমাকে কাজ্‌রিয়া ব'লে উপহাস করে; তাদের সে আঘাত আমি সইতে, উপেক্ষা ক'রতে পারি, আমার সে সহ্যশক্তি আছে,—কিন্তু ওগো নিঠুর! তুমি কেন আমায় ভালবাসি ব'লে উপহাস ক'রছ? ওগো সুন্দর শ্যামল! তুমি কেন এ হতভাগিনীকে আঘাত ক'রছ? এ অপমানের দুর্ব্বার লজ্জা রাখি কোথায়? জানি, আমি কালো কুৎসিৎ, তাই ব'লে ওগো পরদেশী, তোমার কি অধিকার আছে আমাকে এমন ক'রে মিথ্যা দিয়ে প্রলুব্ধ ক'রবার? ছি, ছি, আমায় ভালবাস্‌তে নেই—ভালবাসা যায় না, ভালবাস্‌তে পার্‌বে না! এমন

ক'রে আর আমার দুর্ব্বলতায় বেদনা-ঘা দিও না শ্যামল, দিও না! ও তো আমার অপমান নয়, ও যে আমার ভালবাসার অপমান; তা' কেউ সইতে পারে না! বিদায় শ্যামল, বিদায়!

আমি মনে মনে ব'ললাম,—ওগো অভিমানিনি! অভিমানের গাঢ় বিক্ষোভ তোমায় অন্ধ ক'রেছে, তাই তুমি সকল কথা বুঝেও বুঝ্‌ছ না। আমিও যে তোমার মতই কালো! তুমি তো নিজ মুখেই আমায় শ্যামল ব'লেছ, অথচ সুন্দর ব'ল্‌ছ কেন? তোমার চোখে তুমি আমায় যেমন সুন্দর দেখেছ, আমার চোখে আমিও তেম্‌নি তোমার সৌন্দর্য্য দেখেছি। তোমার ঐ কালো রূপেই আমার চির-আকাঙ্ক্ষিতাকে খুঁজে পেয়েছি যেন সে কোন্ অনাদি যুগের অনন্ত অন্বেষণের পর! আর যদি অধিকারই না থাকে, তবে তুমি আর কারুর আঘাতে বেদনা পেলে না, অথচ আমার স্নেহ সইতে পারলে না কেন? আমারই উপরে বা তোমার কি দাবী পেয়েছ, যার জোরে সবারই আঘাত-বেদনাকে উপেক্ষা ক'রতে পার, শুধু আমাকেই পার না? আমার বক্ষ দলিত ক'রে কি ক'রে আমায় এমন ছেড়ে যেতে পারছ? যার ভালবাসায় বিশ্বাস নেই, তার ওপর তো অভিমান করা চলে না! যাকে বুঝি, আর আমার দাবী আছে, যে, আমার অভিমান এ সহ্য ক'রবে, তারই ওপর অভিমান আসে, তারই ওপর রাগ করা যায়। আমার যে তখন মস্ত বিশ্বাস থাকে, যে, আমার এ অহেতুক অভিমানের আব্দার এ সহ্য ক'রবেই, কেন না, সে যে আমায় ভালবাসে! . . .

সে কোন কথা বুঝল না, চ'লে গেল। এ তীব্র অভিমান যে তার কার ওপর, সে নিজেই ব'লতে পারত না, তবে কতকটা যেন তার এই কালো রূপের স্রষ্টার ওপর। তার বুক-ভরা অভিমান আহত পক্ষী-শাবকের মত যেন সেই দুর্ব্বোধ রূপ-স্রষ্টার পায়ে লুটিয়ে প'ড়ে ব'লছিল,—ওগো, আমাকেই কি সারা দুনিয়ার মাঝে এমন ক'রে কালো কুৎসিৎ ক'রে সৃষ্টি ক'রতে হয়? তোমার কুম্ভ-ভরা রূপের একটী রেণু এ অভাগীকে দিলে কি তোমার ভরা-কুম্ভ খালি হ'য়ে যেত? যদি কালো ক'রেই সৃষ্টি ক'রলে, তবে ঐ অন্ধকারের মাঝে আলোর মত ভালবাসা দিলে কেন? আবার অন্যেরে দিয়ে ভালবাসিয়ে লজ্জিত কর কেন? . . . হায়, সে যে কখনও বোঝেনি, যে, সত্য-সৌন্দর্য্য বাইরে নয়, ভিতরে—দেহে নয়, অন্তরে!

আমি সে দিন এই একটা নতুন জিনিস দেখেছিলাম, যে, যত দিন সে কারুর ভালবাসা পায় নি, তত দিন তার সারা জনমের চাপা অভিমান এমন বিক্ষুব্ধও হ'য়ে ওঠে নি; কিন্তু যেই সে বুঝলে, কেউ তাকে ভালবেসেছে, অম্‌নি তার কান্না-ভরা অভিমান ঐ স্নেহের আহ্বানে দুর্জ্জয় বেগে হাহাকার ক'রে গর্জ্জন ক'রে উঠ্‌ল! এই ফেনিয়ে-ওঠা অভিমানের জন্যেই সে যাকে ভালবাসে তাকে এড়িয়ে গেল। এমন ভালবাসায় যে প্রিয়তমাকে এড়িয়ে চলাতেই আনন্দ! এ বেদনা-আনন্দের মাধুরী আমার মত আর কেউ বোঝে নি!

হায়, আমার মনের এত কথা বুঝি মনেই ম'রে গেল! এ জীবনে আর তা বলা হবে না!

তার পর-বছরের কথা।

কাজ্‌রিয়ার সঙ্গে আবার আমার দেখা হ'ল মির্জ্জাপুরের পাহাড়ের বুকে বিরহী নামক উপত্যকায়। সে দিন ছিল ভাদ্রের কৃষ্ণ-তৃতীয়া। সে দিনও মেঘে আঁধারে কোলাকুলি ক'রছিল! সে দিন ছিল কাজ্‌রী উৎসবের শেষ দিন। সে-দিন বাদল মেঘ ধানের ক্ষেতে তার শেষ বিদায়-বাণী শোনাচ্ছিল, আর নবীন ধানও তার মঞ্জরী দুলিয়ে কেঁপে কেঁপে বাদলকে তার শেষ অভিনন্দন জানাচ্ছিল। হায়, এদের কেউ জানে না, আবার কোন্ মাঠে কোন্ তালী-বনের রেখা-পারে তাদের নতুন ক'রে দেখা-শোনা হবে! আজ সুন্দরীদের চোখের কাজল মলিন, তাদের সুরে কেমন একটা ব্যথিত ক্লান্তি, সুন্দর ছোট্ট মুখগুলি রোদের তাপে শালের কচি পাতার মত ম্লান—এলানো! কাল যে এই সারা-বছরের চাওয়া বাদল-উৎসবের বিসর্জ্জন, এইটাই তাদের এত আনন্দকে বারে-বারে ব্যথা দিয়ে যাচ্ছিল! কে জানে, তাদের এই সব সখীদের এম্‌নি ক'রে পর-বছর আবার দেখা হবে কি না! হয়তো এরই মাঝের কত চেনা মুখ কোথায় মিশিয়ে যাবে, সারা দুনিয়া খুঁজেও সে মুখ আর দেখতে পাবে না!

দোল্‌নার সোনালী রঙ-এর ডোরকে উজ্জ্বলতর ক'রে বারে-বারে ছুরি-হানার মত বিজুরী চ'ম্‌কে যাচ্ছিল! কাজ্‌রী ছুটে এসে আমার ডান হাতটী তার দু' হাতের কোমল মুঠির মধ্যে নিয়ে বুকের উপর রাখ্‌লে, তার পর ব'ললে,—ওগো পরদেশী শ্যামল, তোমায় আমি চিনেছি! তুমি সত্য। তুমি আমায় ভালবাস! নিশ্চয়ই ভালবাস! সত্যি ভালবাস!

দেখলাম, তার শীর্ণ চোখের উজ্জ্বল চাউনীতে গভীর ভাল-

বাসার ছল-ছল জ্যোতিঃ শরৎ-প্রভাতের জল-মাখা রোদ্দুরের মত করুণ হাসি হেসেছে! আহ্, এত দিনের বিরহের কঠোর তপস্যায় সে তার সত্যকে চিন্‌তে পেরেছে! তার খিন্ন মলিন তনুলতার দিকে চেয়ে চেয়ে আমার চোখের জল সাম্‌লানো দায় হ'য়ে উঠ্‌লো! এক বিন্দু অসম্বরণীয় অবাধ্য অশ্রু তার পাণ্ডুর কপোলে ঝ'রে প'ড়তেই সে আমার পানে আর্ত্ত দৃষ্টি হেনে ঐখানেই ব'সে প'ড়লো! বকুল-শাখা আর শিউলি পাতা তার মাথায় ফুল-পাতা ফেলে সান্ত্বনা দিতে লাগ্‌ল!

মতিয়া ব'ললে, এবারও সে অনেক আশা ক'রে আগের বছরের মতই শ্রাবণ-পঞ্চমীর ভোরে কাজ্‌রী গেয়ে যমুনা-সিনানে গিয়ে সেখানকার মাটী দিয়ে ধানের অঙ্কুর উদ্গম ক'রেছিল। সেই অঙ্কুরগুলি সে নিবিড় যতনে তাঁর ছিন্ন ভেজা ওড়্‌না দিয়ে আজও ঢেকে রেখেছে। সে রোজই ব'লত,—মতিয়া রে, এবার আমার পরদেশী বঁধু আস্‌বে! ঐ যে শুনতে পাচ্ছি তার পথিক-গান"

আজ ভাদ্র-তৃতীয়াতে 'নবীন ধানের মঞ্জরী' নিয়ে কতকগুলি সে দরিয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে এসেছে, আর কয়েকটা শীষ এনেছে আমাকে উপহার দিতে!

আমি তার হাতে নাড়া দিয়ে ব'ললাম,—কাজ্‌রি, আর আমায় ছেড়ে যেও না।

শুষ্ক অধর-কোণে তার আধ টুক্‌রো ম্লান হাসি ফুটতে ফুট্‌তে মিলিয়ে গেল! সে অতি কষ্টে তার আঁচল থেকে বহু যত্নে রক্ষিত ধানের সবুজ শীষ ক'টা বের ক'রে একবার তার দু'টী জল-ভরা চোখের পূর্ণ চাওয়া দিয়ে আমার পানে চেয়ে

দেখলে, তার পর আমার স্কন্ধদেশে ক্লান্ত বাহু দু'টী থুয়ে আমার কর্ণে শীষগুলি পরিয়ে দিলে। একটা গভীর তৃপ্তির দীঘল শ্বাসের সঙ্গে পবিত্র একরাশ হাসি তার চোখে মুখে হেসে উঠ্‌ল! দেখে বোধ হ'ল, এমন প্রাণ-ভরা সার্থক হাসি সে যেন আর জন্মে হাসে নি!

আবার একটু পরেই কি মনে হ'য়ে তার সারা মুখ ব্যথায় পাণ্ডুর হ'য়ে উঠ্‌ল। সহসা চীৎকার ক'রে সে ক'য়ে উঠ্‌ল,—না শ্যামল, না,—আমাকে যেতেই হবে! তোমার এই বুক-ভরা ভালবাসার পরিপূর্ণ গৌরব নিয়ে আমায় বিদায় নিতে দাও!

কোলের ওপর তার শ্রান্ত মাথা লুটিয়ে প'ড়ল। চির-জনমের কামনার ধনকে আমার বুকের ওপরে টেনে নিলাম। আকুল ঝঞ্ঝা উন্মাদ বৃষ্টিকে ডেকে এনে আমায় ঘিরে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্‌ল,—ওহ !—ওহ্‌!—ওহ্‌!

আমার মনে হয়, চাওয়ার অনেক বেশী পাওয়ার গর্ব্বই তাকে বাঁচতে দিলে না! সে মরণ-ত্যাগী হ'য়ে তার কালো রূপস্রষ্টার কাছে চ'লে গেল! এবার বুঝি সে অনন্ত রূপের ডালি নিয়ে আর এক পথে আমার অপেক্ষায় ব'সে থাক্‌বে! . . . কালো মানুষ বড্ডো বেশী চাপা অভিমানী। তাদের কালো রূপের জন্যে তারা মনে করে, তাদের কেউ ভালবাস্‌তে পারে না। কেউ ভালবাস্‌ছে দেখলেও তাই সহজে বিশ্বাস ক'রতে চায় না। বেচারাদের জীবনের এইটাই সব-চেয়ে বড় ট্র্যাজেডী।

[বাদল-ভেজা তারই স্মৃতি]

এ-বছরও তেমনি শাঙন এসেছে। আজও আমার সেই প্রথম দিনে-শোনা কাজ্‌রী গানটী মনে প'ড়ছে,—ওগো শ্যামল, তোমার ঘোম্‌টা খোল!

হায় রে পরদেশী সাঁবলিয়া! তোমার এ অবগুণ্ঠন আর জীবনে খুল্‌ল না, খুলবে না! . . .

আজ যখন আমার ক্লান্ত আঁখির সাম্‌নে আকাশ-ভাঙা ঢেউ ভেঙে ভেঙে প'ড়ছে, পূরবী-বায় হু-হু ক'রে সারা বিশ্বের বিরহ-কান্না কেঁদে যাচ্ছে, নিরেট জমাট্‌ আঁধার ছিঁড়ে ঝড়ের মুখে উগ্র মল্লারের তীব্র গোঙানী ব্যথিয়ে উঠ্‌ছে,—ওগো সাম্‌নে আমার পথ নেই—পথ নেই! অনন্ত বৃষ্টির আকুল ধারা বইছে।—এমন সময় কোথায় ছিলে ওগো প্রিয়তম আমার! এ বছরের মেঘ-বাদলে এমন ক'রে আমায় যে দেখা দিয়ে গেলে, আমার প্রাণে যে কথা ক'য়ে গেলে' হারাণো প্রেয়সী আমার! তোমার কানে-কানে-বলা গোপন গুঞ্জন আমি এই বাদলে শুনেছি, শুনেছি।

এই তোমার টাট্‌কা-ভাঙা রসাঞ্জনের মত উজ্জ্বল-নীল গাঢ় কান্তি! ওগো, এই তো তোমার কাজল-কালো স্নিগ্ধ সজল রূপ আমার চোখে অঞ্জন বুলিয়ে গেল! ওগো আমার বারে-বারে-হারাণো মেঘের দেশের চপল প্রিয়! এবার তোমায় অশ্রুর ডোরে বেঁধেছি! এবার তুমি যাবে কোথা? লোহার শিকল বারে-বারে কেটেছ, তুমি মুক্ত-বনের দুষ্ট-পাখী —তাই এবার তোমায় অশ্রুর বাঁধনে বেঁধেছি, তাকে ছেদন করা যায় না! ঐ ঘন নীল মেঘের বুকে, এই সবুজ কচি

দুর্ব্বায়, ভেজা ধানের গাছের রঙে তোমায় পেয়েছি। ওগো শ্যামলী! তোমার এ শ্যাম শোভা লুকাবে কোথায়? ঐ সুনীল আকাশ—এই সবুজ-মাঠ, পথহারা দিগন্ত,—এতেই যে তোমার বিলিয়ে-দেওয়া চিরন্তন শ্যামরূপ লুটিয়ে প'ড়ছে! তাই আজ এই শ্রাবণ-প্রাতে ধানের মাঝে ব'সে গাইছি,—

"আমার নয়ন-ভুলানো এলে!
আমি কি হেরিলাম হৃদয় মেলে
শিউলিতলার পাশে পাশে,
ঝরা ফুলের রাশে রাশে,
শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে
অরুণ-রাঙা চরণ ফেলে
নয়ন-ভুলানো এলে!

যখন চোখ মেলে চাইলাম, তখনও বৃষ্টির ধারা বাঁধ-ছাড়া অযুত পাগলাঝোরার মত ঝ'রে ঝ'রে প'ড়ছে—ঝম্ ঝম্ ঝম্! এত জলও ছিল আজকার মেঘে! আকাশ-সাগর যেন উল্‌টে প'ড়েছে, এ বাদল-বরিষণের আর বিরাম নেই, বিরাম নেই! . . .

বৃষ্টিতে কাঁপতে কাঁপতে দেখলাম, আঁখির আগে আমার নীলোৎপল-প্রভ মানস-সরোবরে ফুটে র'য়েছে সরোবর-ভরা নীল-পদ্ম!

ঘুমের ঘোরে

"This book evinces the author as a chivalrous hero attempting to conquer the subtle corners of the hnman heart. The style is all his own permeated with a freshness, vigour and impetuosity characteristic of his age and hopes."

—The Servant

পউষ এলো গো

পউষ এলো অশ্রু-পাথার হিম-পারাবার পারায়ে!

ঐ যে এলো গো—

কুজ্ঝটিকার ঘোম্‌টা-পরা দিগন্তরে দাঁড়ায়ে।

পউষ এলো গো! পউষ এলো,—

শুক্‌নো নিশাস, কাঁদন-ভারাতুর

বিদায়-ক্ষণের (আ—হা) ভাঙা গলার স্বর,—

ওঠ পথিক! যাবে অনেক দূর

কালো চোখের করুণ চাওয়া ছাড়ায়ে!

—দোলন-চাঁপা—

* * *

ঘুমের ঘোরে

আজ্‌হারের কথা

আফ্রিকা

শাহারার মরূদ্যান সন্নিহিত ক্যাম্প

ঘুম ভাঙ্‌লো। ঘুমের ঘোর তবু ভাঙ্‌লো না! . . . নিশি আমার ভোর হ'ল, সে স্বপ্নও ভাঙ্‌লো—আর তার সঙ্গে ভাঙ্‌লো আমার বুক!

কিন্তু এই যে তা'র শাশ্বত চিরন্তন স্মৃতি, তার আর ইতি নেই! না—না, মরুর বুকে ক্ষীণ একটু ঝর্ণা-ধারার মত এই অম্লান স্মৃতিটুকুই তো রেখেছে আমার শূন্য বক্ষ স্নিগ্ধ-সান্ত্বনায় ভ'রে! ব'য়ে যাও ওগো আমার ঊষর মরুর ঝর্ণা-ধারা ব'য়ে যাও এমনি ক'রে বিশাল সে এক তপ্ত শূন্যতায় তোমার দীঘল রেখায় শ্যামলতার স্নিগ্ধ ছায়া রেখে! দুর্ব্বল তোমার এই পূত ধারাটী বাঁচিয়ে রেখেছে বিরাট্‌ কোন্‌ এক মরুভূ-প্রান্তরকে, তা' তুমি নিজেও জান না,—তবু ব'য়ে যাও ওগো ক্ষীণতোয়া নির্ঝরিণীর নির্ম্মল ধারা, ব'য়ে যাও!

নিশি-ভোরটা নাকি বিশ্ববাসী সবার কাছেই মধুর, তাই এ-সময়কার টৌড়ি রাগিণীর কল-উচ্ছ্বাসে জাগ্রত নিখিল অখিলের পবিত্র আনন্দ-সরসী-সলিলে ক্রীড়ারত মরাল-যূথের মত যেন সঞ্চরণ ক'রে বেড়ায়,—কিন্তু আমার নিশি ভোর না হ'লেই ছিল ভাল। এ আলো আমি আর সইতে পারছিনে,—এ যে আমার চোখ ঝল্‌সিয়ে দিলে! এ কি অকল্যাণময় প্রভাত আমার!

ভোর হ'ল। বনে বনে বিহগের ব্যাকুল কূজন বনান্তরে গিয়ে তার প্রতিধ্বনির রেশ্ রেখে এল! সবুজ শাখীর শাখায় শাখায় পাতার কোলে ফুল ফুট্‌লো! মলয় এল বুলবুলির সাথে শিস্ দিতে দিতে। ভ্রমর এল পরিমল আর পরাগ মেখে শ্যামার গজল-গানের সাথে হাওয়ার দাদ্‌রা তালের তালে তালে নাচ্‌তে নাচ্‌তে। কোয়েল, দোয়েল, পাপিয়া সব মিলে সমস্বরে গান ধ'রলে,—

"ওহে সুন্দর মরি মরি!
তোমায় কি দিয়ে বরণ করি!"

অচিন্ কার কণ্ঠ-ভরা ভৈরবীর মীড় মোচড় খেয়ে উঠ্‌ল—"জাগো পুরবাসী!"—সুষুপ্ত বিশ্ব গা-মোড়া দিয়ে তারই জাগরণের সাড়া দিলে! . . .

"তুমি সুন্দর, তাই নিখিল বিশ্ব সুন্দর শোভাময়!"

—প'ড়ে রইলুম কেবল আমি উদাস আনমনে, আমার এই অবসাদ-ভরা বিষণ্ণ দেহ ধরার বুকে নিতান্ত সঙ্কুচিত গোপন ক'রে,—হাস্যমুখরা তরল উষার গালের একটেরে এক কণা অশুদ্ধ অশ্রুর মত। অথচ এই যে এক বিন্দু অশ্রুর খবর, তা'

ঊষাবালা নিজেই জানে না, গত নিশি খোওয়াবের খাম্‌খেয়ালীতে কখন্ সে কার বিচ্ছেদ-ব্যথা কল্পনা ক'রে কেঁদেছে আর তারই এক রত্তি স্মৃতি তার পাণ্ডুর কপোলে পূত ম্লানিমার ঈষৎ আঁচড় কেটে রেখেছে!

ঘুমের ঘোর টুট্‌লেই শোর ওঠে,—ঐ গো ভোর হ'ল! জোর বাতাসে সেই কথাটী নিভৃত-সব-কিছুর কানে কানে গুঞ্জরিত হয়। সবাই জাগে—ওঠে—কাজে লাগে! আমার কিন্তু ঘুমের ঘোর টুটেও উঠতে ইচ্ছে ক'রছে না! এখনও আফ্‌সোসের আঁসু আমার বইছে আর বইছে।

সব দোরই খুল্‌লো, কিন্তু এ উপুড়-করা গোরের দোর খুল্‌বে কি ক'রে?—না, তা খোলাও অন্যায়, কারণ এ গোরের বুকেআছে শুধু গোর-ভরা কঙ্কাল আর বুক-ভরা বেদনা, যা' শুধু গোরের বুকেই থেকেছে আর থাক্‌বে! দাও ভাই তাকে প'ড়ে থাক্‌তে দাও এম্‌নি নীরবে মাটী কাম্‌ড়ে, আর ঐ পথ বেয়ে যেতে যেতে যদি ব্যথা পাও, তবে শুধু একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলো, আর কিচ্ছু না!

আচ্ছা, আমি এই যে আমার কথাগুলো লিখে রাখ্‌ছি সবাইকে লুকিয়ে, এ কি আমার ভাল হ'চ্ছে? নাঃ, তা' আমি কিছুতেই বুঝে উঠ্‌তে পারছি নে,—এ ভাল, না মন্দ। হাঁ আর এই যে আমার লেখার ওপর কুয়াসার মত তরল একটা আবরণ রেখে যাচ্ছি, এটাও ইচ্ছায় না অনিচ্ছায়?

তাই ব'লছি, এখন যেমন আমি অনেকেরই কাছে আশ্চর্য্য একটা প্রহেলিকা, আমি চাই চিরটা দিনই এম্‌নি ক'রে নিজেকে লুকিয়ে থাক্‌তে—আমার সত্যিকার ব্যথার উৎসে পাথর চাপা দিয়ে আর তারই চারি পাশে আবছায়ার জাল বুনে ছাপিয়ে থাক্‌তে,—বুকের বেদনা আমার গানের মুখর কলতানে ডুবিয়ে দিতে! কেন না, যখন লোকে ভাব্‌বে আর হাস্‌বে, যে, ছি! সৈনিকেরও এমন একটা দুর্ব্বলতা থাক্‌তে পারে!

না না—এখন থেকে আমার বুক সে চিন্তাটার লজ্জায় ভ'রে উঠ্‌ছে! আমার এই ছোট কথা ক'টী যদি এমনি এক করুণ আবছায়ার অন্তরালেই রেখে যাই, তা' হ'লে হয়তো কারুর তা' বুঝবার মাথা-ব্যথা হবে না। আর কোন অকেজো লোক তা' বুঝবার চেষ্টা ক'রলেও আমায় তেমন দূষতে পারবে না!

দূর ছাই যত সব সৃষ্টিছাড়া চিন্তা! কারই বা গরজ প'ড়েছে আমার এ লেখা দেখবার? তবু যে লিখছি?—মানুষ-মাত্রেই চায় তার বেদনায় সহানুভূতি, তা' নইলে তার জীবন-ভরা ব্যথার ভার নেহাৎ অসহ্য হ'য়ে পড়ে যে! দরদী বন্ধুর কাছে তার দুঃখের কথা ক'য়ে আর তার একটু সজল সহানুভূতি আকর্ষণ ক'রে যেন তার ভারাক্রান্ত হৃদয় লঘু হয়। তা' ছাড়া, যতই চেষ্টা করুক, আগ্নেয়গিরি তার বুক-ভরা আগুনের তরঙ্গ যখন নিতান্ত সাম্‌লাতে না পেরে ফুঁপিয়ে ওঠে, তখন কি অত বড় শক্ত পাথরের পাহাড়ও তা' চাপা দিয়ে আট্‌কে রাখ্‌তে পারে? কখনই না। বরং সেটা আট্‌কাতে যাবার প্রাণপণ আয়াসের দরুণ পাহাড়ের বুকের পাষাণ-শিলাকে

চুর-মার ক'রে উড়িয়ে দিয়ে আগুনের যে হল্‌কা ছোটে, সে দুর্নিবার স্রোতকে থামায় কে? . . .

হাঁ, তবু ভাবার বিষয় যে, সে দুর্ম্মদ দুর্ব্বার বাষ্পোচ্ছ্বাসটা আগ্নেয়গিরির বুক থেকে নির্গম হ'য়ে যাবার পরই সে কেমন নিস্পন্দ শান্ত হ'য়ে পড়ে! তখন তাকে দেখ্‌লে বোধ হয়, মৌন এই পাষাণ-স্তূপের যেন বিশ্বের কারুর কাছে কারুর বিরুদ্ধে কিছু ব'লবার কইবার নেই! শুধু এক পাহাড় ধীর-প্রশান্ত-নির্ব্বিকার শান্তি! . . . আঃ সেই বেশ!

আচ্ছা, বাইরে আমি এতটা নিষ্করুণ নির্ম্মম হ'লেও আমার যে এই মরু-ময়দানের শুক্‌নো বালির নীচে ফল্গুধারার মত অন্তরের বেদনা, তার জন্যে করুণায় একটী আঁখিও কি সিক্ত হয় না? এতই অভিশপ্ত বিড়ম্বিত জীবন আমার? হয়তো থাক্‌তেও পারে! তবু চাইনে যে?—না, ভাই, না, প্রত্যাখ্যান আর বিদ্রূপের ভয় ও বেদনা যে বড় নিদারুণ! তাই আমার অন্তরের ব্যথাকে আর লজ্জাতুর ক'রতে চাই নে—চাই নে। হয়তো তা'তে সে কোন্‌ এক পবিত্র স্মৃতির অবমাননা করা হবে। সে তো আমি সইতে পার্‌ব না! অথচ একটু সান্ত্বনাও যেন এ নিরাশ নীরস জীবনে খুবই কামনার জিনিস হ'য়ে প'ড়েছে। এখন আমার সান্ত্বনা হ'চ্ছে এই লিখেই—এম্‌নি ক'রে আমার এই গোপন খাতাটীর শাদা বুকে তারই সেই বেদনাতুর মূর্ত্তিটীরই প্রতিচ্ছবি আবছায়ায় এঁকে। আমার শাদা খাতার এই কালো কথাগুলি আর গানের স্নিগ্ধ-কল্লোল এই দু'টী জিনিসই আমার আগুন-ভরা জীবনে সান্ত্বনা-ক্ষীর ঢেলে দিচ্ছে আর দেবে! . . .

আমার আজ দুনিয়ার কারুর ওপর অভিমান নেই আমার সমস্ত মান-অভিমান এখন তোমারই উপর খোদা! তুমিই তো আমায় এমন ক'রে রিক্ত ক'রেছ, তুমিই যে আমার সমস্ত স্নেহের আশ্রয়কে ঝ'ড়ো-হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে সারা বিশ্বকে আমার ঘর ক'রে তুলেছ,—এখন পর হ'লে চ'লবে না—এড়িয়ে যেতেও পারবে না! এখন তুমি না সইলে এ দুরন্তের আব্‌দার অত্যাচার কে সইবে বল? ওগো আমার দুর্জ্ঞেয় মঙ্গলময় প্রভু, এখন তুমিই আমার সব!

হাঁ, এখনই লিখে থুই, নইলে কে জানে কোন্ দিন দুষ্‌মনের শেলের একটা তীব্র আঘাত ক্ষণিকের জন্যে বুকে অনুভব ক'রে চিরদিনের মত নিথর-নিঝুম হ'য়ে প'ড়ব—এই মহাসমর-সাগরে ছোট্ট এক বুদ্বুদের মতই মাথা তুলে উঠেছি, আবার হয়তো এক পলকেই আমার ক্ষুদ্র বুকের সমস্ত আশা-উৎসাহ ব্যথা-বেদনা থেমে গিয়ে ঐ বুদ্বুদটীর মতই কোথায় মিলিয়ে যাব! কেউ আহা ব'লবে না—কেউ উহু ক'রবে না! আমার কাছে সেই মৃত্যুর চিন্তাটা কেমন-এক-রকম প্রশান্ত মধুর!

আর একটা কথা,—আমাকে কিন্তু বাইরে এখনকার মতই এম্‌নি রণদুর্ম্মদ, কর্ত্তব্যের সময় এম্‌নিই মায়া-মমতাহীন ক্রুর সেনানী, যুদ্ধে সমুদ্রের উচ্ছ্বাসের চেয়েও দুর্ব্বিনীত দুর্ব্বার নর-রক্তপিপাসু দুর্দ্দান্ত দানবের মতই থাকতে হ'বে! কলের

মানুষের মত আমার অধীন সৈনিকগণ যেন আমার হুকুম মানতে শেখে। আমার দায়িত্বজ্ঞানে আমার কাজে কলঙ্ক বা শৈথিল্যের যেন এতটুকু আঁচড় না পড়ে! সৈনিকের যে এর বড় বদনাম নেই। তার পর কর্ত্তব্য অবসানেই আমি তা'দের সেই চিরহাস্য-প্রফুল্ল গীতি-মুখর স্নেহময় ভাই। তখন আমার এই অগ্নি-উদ্গারী নয়নেই যেন স্নেহের সুরধুনী ক্ষরে, বজ্র-নির্ঘোষের মত এই কাঠ্‌চোটা স্বরেই যেন করুণা আর স্নেহ ক্ষীর হ'য়ে ঝরে, আমার কণ্ঠ-ভরা গানে তাদের চিত্তের সব গ্লানি দূর হ'য়ে যায়! আমার অন্তর আর বাহির যেন এমন একটা অস্বচ্ছ আবরণে চির-আবৃত থাকে, যে, কেউ আমার সত্যিকার কান্নারত মূর্ত্তিটী দেখতে না পায়, হাজার চেষ্টাতেও না!

খোদা আমার অন্তরের এই উচ্ছ্বসিত তপ্তশ্বাস যেন আনন্দ-পূরবীর মুখরতানে চিরদিনই এমনই ঢাকা প'ড়ে যায়, শুধু এইটুকুই এখন তোমার কাছে চাইবার আছে! আর যদি এই অজানার অচিন ব্যথায় কোন অবুঝ হিয়া ব্যথিয়ে ওঠে, তবে সে যেন মনে মনে আমার প্রার্থনায় যোগ দিয়ে বলে,—"আহা, তাই হোক্!" কেননা এমনিতর স্নেহ-কাঙাল যা'রা,—যাদের মৃত্যুতে এক ফোঁটাও আঁসু ফেল্‌বারও কেউ নেই এ দুনিয়ায়, যারা কারুর দয়া চায় না, অথচ এক বিন্দু স্নেহ-সহানুভূতির জন্য উদ্বেগ-উন্মুখ হ'য়ে চেয়ে থাকে,—তাদের দেবার এর বেশী কিছু নেই, আর থাকলেও তা'রা তা চায়ও না। এই একটু স্নিগ্ধ বাণীই গুহার ম্লান বুকে জোৎস্নার শুভ্র আলোর মত তা'দের সান্ত্বনা দেয়।

সে ছিল এমনি এক চাঁদিনী-চর্চ্চিত যামিনী, যা'তে আপনি দয়িতের কথা মনে হ'য়ে মর্ম্মতলে দরদের সৃষ্টি করে। মদির খোশ্-বুর মাদকতায় মল্লিকা-মালতীর মঞ্জুল মঞ্জরীমালা মলয় মারুতকে মাতিয়ে তুলেছিল। উগ্র রজনীগন্ধার উদাস সুবাস অব্যক্ত অজানা একটা শোক-শঙ্কায় বক্ষ ভ'রে তুলছিল।

সে এল মঞ্জীর-মুখর চরণে সেই মুকুলিত লতাবিতানে! তার বাম করে ছিল চয়িত ফুলের ঝাঁপি। কবরী-ভ্রষ্ট আমের মঞ্জরী শিথিল হ'য়ে তারই বুকে ঝ'রে ঝ'রে প'ড়ছিল, ঠিক পুষ্প-পাপড়ি বেয়ে পরিমল ঝরার মত। কপোল-চুম্বিত তার চূর্ণকুন্তল হ'তে বিক্ষিপ্ত কেশর-রেণুর গন্ধ লুটে নিয়ে লালস-আলস ক্লান্ত সমীর এরই খোশ্ খবর চারিদিকে রটিয়ে এল,—ওগো ওঠ, দেখ ঘুমের দেশ পেরিয়ে স্বপ্ন-বধূ এসেছে! উল্লাস-হিল্লোলে শাখায় শাখায় ঘুমন্ত ফুল দোল খেয়ে উঠ্‌ল! আমার কপাল ঘামে ভ'রে উঠ্‌ল, বক্ষ দুরু দুরু ক'রে কাঁপিয়ে গেল সে কোন্ বিবশ শঙ্কা। ঘন ঘন শ্বাস প'ড়ে আমার হাতের কামিনী-গুচ্ছটীর দলগুলি খ'সে খ'সে প'ড়তে লাগ্‌ল! আমার বোধ হ'ল, এ কোন্ ঘুমের দেশের রাজকন্যা আমার কিশোরী মানস-প্রতিমার পূর্ণ পরিণতির রূপে এসে আমার চোখে স্বপ্নের জাল বুনে দিচ্ছে। ভয়ে ভয়ে আমার আবিষ্ট চোখের পাতা তুলেই দেখ্‌তে পেলুম, বেতস লতার মত সে আমার সাম্‌নে অবনত মুখে দাঁড়িয়ে কাঁপছে! আমাকে চোখ মেলে চাইতে দেখে যেন সে চ'লে যেতে চাইলে। আমি তাড়াতাড়ি ভীত জড়িত স্বরে ব'ললুম,—কে তুমি?

তার আয়ত আঁখির এক অনিমিখ চাউনী দিয়ে আমার

পানে চেয়েই সে থ'ম্‌কে দাঁড়াল! শুক্ল জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট দেখতে পেলুম, তার দু'টী বড় বড় চোখে চোখ-ভরা জল! . . . এক পলকে পরীর নূপুরের রুণু-ঝুণু শিঞ্জিনী চ'মকে যেন কি ব'লে উঠ্‌ল। আনন্দ-ছন্দের হিন্দোলার দোল আর দুল্‌ল না। অসম্বৃতা তা'র লুণ্ঠিত চঞ্চল অঞ্চল সম্বৃত হ'ল। শিথিলবসনার ফুল্ল কপোলে লাজ-শোণিমা বিদীর্ণপ্রায় দাড়িম্বের মত হিঙ্গুল হ'য়ে ফুট্‌ল! সমীরের থামার সাথে সাথে যেন উলসিত-সরসী-সলিলের কল-কল্লোল নিথর হ'য়ে থাম্‌লো, আর তারই বুকে এক রাশ পাতার কোলে দু'টী রক্ত-পদ্ম ফুটে উঠ্‌ল। ত্রস্তা কুরঙ্গীর মত ভীতি তার নলিন-নয়নে করুণার সঞ্চার ক'রলে। বার বার সংযত হ'য়ে ক্ষীণকণ্ঠে সে কইলে,—তুমি—আপনি কখন এলেন? . . .

আমি ব'ললুম,—আজ এসেছি।—তুমি বেশ ভাল আছ পরী?

সে একটু ক্লিষ্ট হাসি হেসে কইলে,—হাঁ—আজ এখানে মা আর আমাদের বাড়ীর সকলে বেড়াতে এসেছেন। এ বাগানটা ভাই-জান নতুন ক'রে ক'রলেন কি না! ঐ যে তাঁরা পুকুরটার পাড়ে ব'সে গল্প ক'রছেন।

আমার নেশা যেন অনেকটা কেটে গেল। তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে ব'ললুম,—ওঃ, আজ প্রায় দু' বছর পরে আমাদের দেখা—নয় পরী! তোমাকে যেন একটু রোগা-রোগা দেখাচ্ছে, কোন অসুখ করেনি তো?

সে তার ব্যথিত দু'টী আঁখির আর্ত্ত দৃষ্টি দিয়ে আমার পানে অনেক ক্ষণ চেয়ে অস্ফুট কণ্ঠে ব'ললে,—না! . . .

তা'র পরেই যেন তা'র কি কথা মনে প'ড়ে গেল। সে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ক'য়ে উঠ্‌ল,—আপনি! এখানে কেন আর? যান! . . .

এক নিমিষে এমন আকাশ-ভরা জ্যোৎস্না যেন দপ্‌ ক'রে নিভে গেল! একটা অপ্রত্যাশিত আঘাতের বেদনায় সমস্ত দেহ আমার অনেক ক্ষণের জন্যে নিসাড় হ'য়ে রইল। কখন যে মাথা ঘুরে প'ড়ে পাশের বেঞ্চিটার হাতায় লেগে আমার বাম চোখের কাছে অনেকটা কেটে গিয়ে তা দিয়ে ঝর্‌-ঝর্‌ ক'রে খুন প'ড়ছিল, আর পরী তার আঁচলের খানিকটা ছিঁড়ে আমার ক্ষতটায় পটি বেঁধে দিয়েছিল, তা আমি কিছুই জান্‌তে পারি নি! যখন চোখ মেলে চাইলুম, তখন পরী আমার আঘাতটাতে জল চুঁইয়ে দিচ্ছে, আর সেই চোঁয়ানো জলের চেয়েও বেগে তা'র দু' চোখ বেয়ে অশ্রু চুঁয়ে প'ড়ছে! . . . এতক্ষণে আহত অভিমান আমার সারা বক্ষ আলোড়িত ক'রে গুম্‌রে উঠ্‌ল। বিদ্যুদ্বেগে সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে আহত স্বরে ব'ললুম, —বড় ভুল হ'য়েছে পরী, তুমি আমায় ক্ষমা ক'রো।

অনেক ক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে যেন কি সাম্‌লে নিয়ে, তার পরে আনমনে চিবুক ছোঁওয়া তার একটা পীত গোলাবের পাপড়ি নখ দিয়ে টুঙ্‌তে টুঙ্‌তে অভিভূতের মত কি ব'লে উঠ্‌ল।

আমি আর দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারলুম না, ব'ললুম,—তবে যাই পরী!

অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে সে ব'লে উঠ্‌ল, —আহ্‌,—তাই যাও!

কিন্তু জ্যোৎস্না-বিবশা নিশীথিনীর মতই যেন তার চরণ

অবশ হ'য়ে উঠেছিল, তাই কুণ্ঠিত অবগুণ্ঠিত বদনে সে পাথরের মত সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল। যখন দেখ্লুম, হেমন্তের শিশির-পাতের মত তার দুই গণ্ড বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে প'ড়ছে, তখন অতি কষ্টে আমার এক বুক দীর্ঘশ্বাস চেপে চ'লে এলুম। তখন তীক্ষ্ণ ক্লেশের চোখা বাণ আমার বাইরে ভিতরে এক অসহনীয় ব্যথার সৃষ্টি ক'রছিল। মনে হ'চ্ছিল, এই চাঁদিমা-গর্ব্বিত যামিনীর সমগ্র বক্ষ ব্যেপে শাহানা সুরের পাষাণ-ফাটা কান্না আকণ্ঠ ফুঁপিয়ে উঠছে, আর তাই সে শুধু সিক্ত চোখে মৌন মুখে আকাশ-ভরা তারার দিকে তাকিয়ে ভাবছে, আকাশের মত আমারও মর্ম্ম ভেদ ক'রে এম্নি কোটি কোটি আগুন-ভরা তারা জ্ব'ল্ছে,—উষ্ণতায় সে-গুলো মার্ত্তণ্ডের চেয়েও উত্তপ্ত। স্থির সৌদামিনীর মত সে-গুলো শুধু জ্বালাময়ী প্রখর তেজে জ্ব'ল্ছে—ধূ-ধূ-ধূ!

এটাও একবার কিন্তু মনে হ'য়েছিল সে দিন, যে, অ—কি হতভাগা আমি! যা পেয়েছিলাম তাতেই সন্তুষ্ট থাকলুম না কেন?

দূরে থেকে ঐ একটু অনুরাগসঞ্চিত সলাজ চাউনী,—নানান্ কাজের অনর্থক ব্যস্ততার আড়ালে দু' তিন বার দৃষ্টি-বিনিময়, হঠাৎ একটী শিহরণ-ভরা পরশ,—যাই-যাই ক'রেও না যেতে পারার সলজ্জ কুণ্ঠা,—মুখর হাসি ওষ্ঠ-অধরের

নিষ্পেষণে চাপতে গিয়ে চোখের তারায় ফুটে ওঠা, আর সেই শরমে কর্ণমূলটী আরক্ত হ'য়ে ওঠা—এই সব ছোট-খাট পাওয়া আর টুক্‌রো টুক্‌রো আনন্দের গাঢ় অনুভূতি আমার প্রাণে যে এক নিবিড় মাধুরীর মাদকতা ঢেলে নেশায় মশ্‌গুল ক'রে রেখেছিল, তার চেয়েও বেশী আমি তো আর পেতে চাইনি, তবে কেন সে আমায় এত অপমান ক'রলে? . . .

আমি তাকে ভালবেসে আস্‌ছি, সে-যে কবে থেকে তার কোন দিন-ক্ষণ মনে নেই; বড় প্রাণ দিয়েই ভালবেসেছি তাকে, কিন্তু কোন দিন কামনা করিনি! আগেও মনে হ'ত আর আজও হয়, যে, তাকে না পেয়ে আমার জীবনটা ব্যর্থই হ'য়ে গেল,—তবু প্রাণ ধ'রে কোন দিনই তো তাকে কামনা ক'রতে পারিনি। বরং যখনই ঐ বিশ্রী কথাটা—মিলন আর পাওয়ার এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো দিক্‌টা, একটুখানির জন্যে মনের কোণে উঁকি মেরে গিয়েছে, তখনই যেন লজ্জায় আর বিতৃষ্ণায় আমার বুক এলিয়ে প'ড়েছে। এত ভুবন-ভরা ভালবাসা আমার কি শেষে দু' দিনেই বাসি হ'য়ে প'ড়তে দেব?—ছি ছি! না না!

সে দিন মনে হ'য়েছিল, যে-ভালবাসা দু' জনের দেহকে দু' দিক্ থেকে আকর্ষণ ক'রে মিলিয়ে দেয়, সে তো ভালবাসা নয়, সেটা অন্য কিছু বা মোহ আর কামনা। হয়তো এই মোহটাই শেষে ভালবাসায় পরিণত হ'তে পার্‌ত এম্‌নি দূরে দূরেই থেকে, কিন্তু এক নিমিষের মিলনেই সে পবিত্র ভালবাসা কেমন বিশ্রী কদর্য্যতায় ভ'রে গেল! প্রেমের মিলন তো এত সহজে এমন বিশ্রী হ'য়ে নয়! তাই জীবন আমার ব্যর্থ হবে জেনেও আমি প্রাণ থাকৃতে তার সঙ্গে মিলি নি। জীবন-ভরা

দুঃখ আর ক্লেশ-যাতনা অপমানের পসরা মাথা পেতে নিয়েছি, তবু আমি ভুলেও ভাবতে পারি নি, যে, এমনি নির্লজ্জের মত এসে এই আঁধার-পথের মামুলী মিলনে আমার প্রিয়ার অবমাননা করি। আমি জানি, এম্‌নি ক'রেই তাকে এমন ক'রে পাব, যে-পাওয়া সকলে পায় না! কেউ ব'লে না দিলেও আমার বিশ্বাস আছে, যে, আজ যাকে ব্যর্থ ব'লে মনে ক'রছি, আমার জীবনে সেই ব্যর্থতাই এক দিন সার্থকতায় পুষ্পিত পল্লবিত হ'য়ে উঠবে— তাকে ভালবাসি ব'লেই তাকে এমন ক'রে এড়িয়ে এলুম, এই কথাটা বুঝ্‌তে না পেরেই কি সে আমায় এমন ক'রে প্রত্যাখ্যান ক'রলে! হায়! প্রাণ-প্রিয়তমের পাওয়াকে এড়িয়ে চ'লবার ধৈর্য্য আর শক্তি পেতে যে আমি কত বেশী বেদনা আর কষ্ট পেয়েছি, তা তুমি বুঝবে না পরী—বুঝবে না! তবু কিন্তু বড় কষ্ট র'য়ে গেল, যে, হয়তো তুমি আমার ভালবাসার গভীরতা বুঝ্‌তে পার্‌লে না! তোমায় অন্যকে বিলিয়ে দিয়ে তোমায় যত বেদনা দিয়েছি, তার চেয়ে কত বেশী ব্যথা যে আমাকে চাপ্‌তে হ'য়েছে, কত বড় কষ্ট যে নীরবে সইতে হ'য়েছে, তা' যদি তুমি জান্‌তে পার্‌তে পরী, তা হ'লে সে দিন এই কথাটা মনে ক'রে আমায় এত বড় আঘাত ক'রতে পার্‌তে না! . . .

আমি জানি প্রিয়, সে দিন তোমার আসবেই আসবে, যে দিন আমার এই অভিশপ্ত জীবনের সকল কথা সকল আশা অন্ততঃ তোমার কাছে লুকানো থাক্‌বে না। এ তুমি নিজেই আপ্‌না-আপনি বুঝ্‌তে পার্‌বে, কাউকে তা ব'লে দিতে বা বুঝিয়ে দিতে হবে না। কিন্তু সে দিন কি আমি আর এ জীবনে

জান্‌তে পারব প্রিয়, তুমি আমায় ভুল বোঝ নি? তা যদি না জান্‌তে পারি, তবে আফ্‌সোস্ প্রিয় আফ্‌সোস্! . . .

এই নাও, আমার সব ঘুলিয়ে গেল দেখছি! এ যেন ঠিক ঘুমের ঘোরে হাজার রকমের স্বপ্ন দেখার মত! কোনটার সঙ্গে কোনটারই সামঞ্জস্য নেই, অথচ অলক্ষ্য থেকে স্বপ্ন-রাণী সবগুলিকে একটী ক্ষীণ সূতো দিয়েই গেঁথে দিচ্ছে। আমার সব কথাগুলো যেন ঠিক লাখো ফুলের এলোমেলো মালা!

আবার আমার মনে হ'চ্ছে, আমার পক্ষে তার কাছে ও-রকম ক'রে কথা কওয়া বা দেখা দেওয়া কিছুতেই উচিত হয় নি। কেননা সে নিশ্চয় মনে ক'রেছিল, যে, আমি আমার মিথ্যা অহঙ্কারকে কেন্দ্র ক'রে তার কাছে ত্যাগের গর্ব্ব দেখাতে গিয়েছিলুম, আর তাই হয়তো যখন এই কথাটা তার হঠাৎ মনে হ'ল, অম্‌নি কেমন একটা বিতৃষ্ণায় তার মন ভ'রে উঠ্‌ল, আর সে আমায় ও-রকম নির্দ্দয়তা না দেখিয়েই পার্‌লে না।—আর একটা কথা, কেউ একটু সামান্য প্রশ্রয় দিলেই আমাদের মত স্নেহ-বুভুক্ষু হতভাগারা এতটা বাড়াবাড়ি ক'রে তোলে, যে, সে তখন এই দুর্ভাগাদের চেতন করিয়ে দিতে বাধ্য হয়; আর আমরা সেইটাকে হয়তো অপমানের আঘাত ব'লেই মনে করি। এটা তো আমাদেরই দোষ!

অন্তরের গোপন কথা অন্তরেই না রাখতে পেরে বাইরে প্রকাশ ক'রে দেওয়ার যে দুর্ব্বার লজ্জা আর অক্ষমণীয় অপমান, তা হ'তে আমায় রক্ষা কর খোদা, রক্ষা কর! এর যা শাস্তি, তা বড় নির্ম্মম নিষ্করুণ হ'য়েই আমার মাথার ওপর চাপাও।

কিন্তু ঘুমের ঘোর আমার এখনও কাটে নি। মন এমন একটা জিনিস বা মনের এমন একটা দুর্ব্বলতা আছে, যে, সে সহজে কোন জিনিসের শক্ত দিক্‌টা দেখতে চায় না। বুঝ্‌লেও অবুঝের মত সে-দিক্ থেকে মুখ ফিরিয়ে চ'লতে চায়। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, কে যেন মনের মুণ্ডুটা ধ'রে ঐ নিষ্করুণ নীরস দিক্‌টাই দেখতে বাধ্য করায়; সে বোধ হয়, মনেরই পেছনে প্রচ্ছন্ন একটা দুর্নিবার শক্তি।

দেখেছ মজা! আমার মন এটা নিশ্চয়ই জেনে ব'সেছে, যে, সে আমাকে আমার চেয়েও বেশী ভালবাসে। তবে সে দিন যে সে আমায় অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিলে? সে বড় দুঃখে গো, বড় দুঃখে! তার মত অভিমানিনীর আত্মমর্য্যাদাকে ডিঙিয়ে চলার সামর্থ্য নেই। তাই বড় কষ্টে তাকে এত শক্ত হ'তে হ'য়েছিল। নইলে ঐ নিষ্ঠুর কথাটা ব'লবার পরই কেন হু-হু ক'রে অশ্রুর হড়্‌পা-বান ব'য়ে গেল তার চোখের বুকের সব আবরণ ভাসিয়ে দিয়ে! সব মিথ্যা হ'তে পারে, কিন্তু ঐটা—এত বড় একটা সত্য তো মিথ্যা হ'তে পারে না। অন্ধ, তুমি সেই সময় যদি তার মর্ম্মন্তুদ ব্যথার বেদনা বুঝতে পারতে, তার এই অভিমান-বিধুর অকরুণ কথার উৎস কোথায় দেখতে পেতে, তা হ'লে আজ ঐ মিথ্যা দুঃখটা তোমায় এত কষ্ট দিত না! সে যদি এত বেশী অভিমানিনী না হ'ত, তা হ'লে সাধারণ রমণীর মত অনায়াসে তোমার পায়ে মুখ গুঁজে প'ড়ে কেঁদে উঠ্‌ত,—ওগো অকরুণ দেবতা! খুব ক'রেছ! খুব উদারতা দেখিয়েছ, আর এ হতভাগিনীকে জ্বালিও না! এতই দেবত্ব দেখাতে চাও যদি, তবে এসো না।

কিন্তু তা হ'লে তো "আমার প্রিয় মহান্!" এই কথাটার গৌরবে আমার রিক্ত বুক এমন ক'রে ভ'রে উঠতে পারত না!—ভালই ক'রেছ খোদা, তুমি ভালই ক'রেছ! প্রতি দিনের মত আজ তাই বড় প্রাণ হ'তেই ব'লছি,—তুমি চিরমঙ্গলময়! আবার ব'লছি,—"তোমারই ইচ্ছা হউক্ পূর্ণ করুণাময় স্বামী!"

এ আর এক দিনের কথা। . . . পরী তার তে-তালার দালানের কামরায় ব'সে নিশীথ-রাতের সুষুপ্তিকে ব্যথিয়ে আনমনে গাচ্ছিল,—দিগ্-বালারা আজ জাগ্‌ল না। নব-ফাল্গুনে মেঘ ক'রেছে। মুখর ময়ূরের কলকণ্ঠের সাথে মাঝে মাঝে আকুল মেঘের ঝম্‌ঝমানী শোনা যাচ্ছে, ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্! . . . নিত্যকার নৃত্যমুখর প্রভাত এখন রোজই স্তব্ধ হ'য়ে শুধু ভাবে আর ভাবে। বর্ষণ-পুলকিত পুষ্প-আকুলিত এই বল্লী-বিতানের আর্দ্র-স্নিগ্ধ ছায়ে ব'সে আমার মনে হয়, আমার প্রিয়তমাকে আমি হারিয়েছি, আবার মনে হয়, না, বড় বুক ভ'রেই পেয়েছি গো তাঁকে পেয়েছি! আজ আমার ফুল-শয্যার নিশিভোর হবে। এ ভোরে বারিও ঝ'রবে, বারি-বিধৌত ফুলও ঝ'রবে, আবার শিশুর-মুখে-অনাবিল-হাসির মত শান্ত কিরণও ঝ'রবে! ওগো আমার বসন্ত-বর্ষার বাসর-নিশি, তুমি আর যেও না—হায় যেও না!

আবার বিজন কুটীরে সেই গান আমার বিনিদ্র কানে যেন এক রোদন-ভরা প্রতিধ্বনি তুল্‌ছিল। আমি ভাবছিলুম, যে,

হায়, মাঝে আর তিনটী দিন বাকী! তার পর এই পনর বছরের চেনা-গলার মিঠা আওয়াজ আর শুনতে পাব না, এই আমার বিশ বছরের জীবনে জড়িয়ে-পড়া নিতান্ত আপনার মানুষটীকে হারাতে হবে। কিন্তু হয়তো সারা জনম ধ'রে এরই রেশ আমার প্রাণে বীণার ঝঙ্কার তুলবে। . . . এই তিনটী দিনই মাত্র তাকে আমার ব'লে ভাব্‌তে পার্‌ব, তার পরে আমার কাছে তার চিন্তাটা যেমন দূষণীয়, তার কাছেও আমার চিন্তাটা সেই রকম অমার্জ্জনীয় অপরাধ হবে। আর এক জনের হ'য়ে সে কোন্ দূর দেশে চ'লে যাবে, আমিও চ'লে যাব সে কোন্ বাঁধন-হারার দেশ পেরিয়ে। তার পর দীর্ঘ বিধুর-মধুর অলঙ্ঘনীয় একটা ব্যবধান! . . .

এই সব কথা মনে প'ড়তেই আমি বৃষ্টি-ধারার ঝম্-ঝমানীর সাথে গলার সুর বেঁধে গাইলুম,—ওগো প্রিয়তম, এস আমরা দু' জনেই পিয়াসী চাতক-চাতকীর মত কালো মেঘের কাছে শান্ত বৃষ্টি-ধারা চাই। আমরা চাঁদের সুধা নেব না প্রিয়! আমরা তো চকোর-চকোরী নই। চাতক-মিথুন আমরা চাইব শুধু বর্ষণের পূত আকুল ধারা। এস প্রেয়সী আমার, এই আমাদের ফাল্গুনের মেঘ-বাদলের দিনে আমরা উভয়ে উভয়কে স্মরণ করি আর চ'লে যাই। এই বসন্ত-বর্ষার নিশিথিনীর মতই আমার মনের মাঝে এস তোমার গুঞ্জরণ-ভরা ব্যথিত চরণ ফেলে! . . . তার পরে দূরে দাঁড়িয়ে সজল চারিটী চোখের চাউনীর নীরব ভাষায় বলি,—'বিদায়!' . . .

সে আমার গান শুনেছিল কি না, জানি নে। কিন্তু সে সময় মেঘের ঝরা থেমেছিল, আর তার বাতায়ন চিরে ম্লান

একটু দীপ-শিখা আমার বিজন কুটীরে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে নেমেছিল! . . .

তার পর ঝ'ড়ো হাওয়ার সাথে মেতে আগল-ছাড়া পাগল মেঘের ঐ এক-রোখা শব্দ,—রিম্‌—ঝিম্‌—রিম্‌! . . .

বিসর্জ্জনের দিন। নহবৎ-খানায় তারই বিসর্জ্জনের বাজনা বাজছে। সান্ত্বনা আর অশান্ত এক-বুক বেদনা—এই দু'টো মিলে আমায় এমন অভিভূত ক'রে ফেলেছে, যে, অতি কষ্টে আমার এ শ্রান্ত দেহটাকে খাড়া ক'রে রেখেছি। আর—আর একটু পরেই যেন খুঁটি-দিয়ে-খাড়া-করা এই জীর্ণ ঘরটা হুড়-মুড় ক'রে ধ্ব'সে প'ড়বে। . . .

বাইরে বেরিয়ে এলুম। সেখানেও ঐ একই একটা অশোয়াস্তি আর অরুন্তুদ যন্ত্রণা! নিদাঘ সাঁঝের ধূসর আকাশ ব্যথায় উদাস-পাণ্ডুর হ'য়ে ধরার বুক আঁক্‌ড়ে হুম্‌ড়ি খেয়ে প'ড়েছিল, আর অলক্ষ্যে ক্রমেই সে বেদনায় গুমোট কালো-জমাট হ'য়ে আস্‌ছিল। আমের মুকুলের সাথে পাশের গোরস্থান থেকে গুলঞ্চের মালঞ্চ যে করুণ সুগন্ধের আমেজ দিচ্ছিল, তাতে আমি কিছুতেই কান্না চেপে রাখতে পারছিলুম না। ওঃ! সে কি দুর্জ্জয় অহেতুক কান্নার বেগ! এই রোদনের সাথে একটা ক্লান্তি-ভরা স্নিগ্ধতাও যেন ফেনিয়ে আমার ওষ্ঠ পর্য্যন্ত ছেপে উঠছিল!

পরীর বিয়ে হ'ল। . . দৃষ্টি-বিনিময় হ'ল। সম্প্রদান হ'ল। তার পরেই আমি আর এই কথাটা গোপন রাখ্‌তে পারলুম না, আমি যুদ্ধে যাচ্ছি। তখন সকলেই এক বাক্যে স্বীকার ক'রলে, যে, আমাদের মত আত্মীয়-স্বজনহীন ভবঘুরে হতভাগাদের জন্যেই বিশেষ ক'রে এই সৈন্যদলের সৃষ্টি! আমিও মনে মনে ব'ললুম,—তথাস্তু! . . দু'-এক জন বন্ধু মামুলী ধরণের লৌকিকতা দেখিয়ে এক-আধটু দুঃখ প্রকাশও ক'রলেন।

সে দিন কেঁদেছিল শুধু আমার দূর সম্পর্কের একটী ছোট বোন্! তাই তার সঙ্গে দেখা ক'রতে গেলে সে ব'ললে,—যাও ভাই-জান্! হয়তো আর তোমায় ফিরে পাব না! তবু কিন্তু তুমি এত বড় একটা কাজে যাচ্ছ, যে, সেটায় বাধা দেওয়াও মস্ত পাপ আর স্বার্থপরতা। এমন একটা কাজে জীবন উৎসর্গ ক'রতে গেলে দেশের কোন বোনই যে তার ভাইকে বাধা দিতে পারে না। আমাদের দেশে বীরাঙ্গনা না থাক্‌লেও বীর-ভাইদের বোন্ হওয়ার মত সৌভাগ্যবতী অনেক রমণী আছেন। তাঁরাও নিশ্চয়ই নিজের ভাইকে বীর-সাজে সাজিয়ে দেশরক্ষা ক'রতে পাঠাতে পারেন! ভুলে যেও না ভাই-জান, যে, রণদুর্ম্মদ মুসলমান জাতির উষ্ণ রক্ত আমাদেরও দেহে র'য়েছে। আমরাও আসছি সেই একই উৎস হ'তে। এ রক্ত তো শীতল হবার নয়! . . .

আমি আমার এই মুখরা বোন্‌টীকে বড় বেশী স্নেহ ক'রতুম। তাই তার সেদিনকার এই সব কথায় গৌরবে আমার বুক ভ'রে উঠেছিল। আমার অসম্বরণীয় অশ্রু রুখ্‌তে

গিয়ে দেখ্‌লুম, ততক্ষণে আমার ছোট বোনের চোখ দু'টী জলে ভাস্‌ছে। তাকে আর কখনও কাঁদ্‌তে দেখিনি। একটু প্রকৃতিস্থ হ'য়ে অশ্রু-বিকৃত কণ্ঠে সে আমায় ব'ললে,—তোমাকে কেউ বাধা দিতে নেই ব'লে তুমি হয়তো অন্তরে বড় কষ্ট পাচ্ছ ভাইজান, কিন্তু এটা নিশ্চয় জেনো, যে, আমার মত আজ অনেকেই তোমার কথা ভেবে লুকিয়ে কাঁদ্‌ছে! হাঁ, একটা কথা। একবার আমার সই পরীদের বাড়ী যাও। এ শেষ-দেখায় কোন লজ্জা-শরম ক'রো না ভাই! পরী বড় অস্থির হ'য়ে প'ড়েছে, তার অন্তিম অনুরোধ, একবার তাকে দেখা দাও! . . .

হায় রে সংসার-মরুর স্নেহ-নির্ঝরিণী-স্বরূপা ভগিনিগণ! তোরা চিরকালই এমনি সন্ন্যাসিনী, অথচ ভারে ভারে পবিত্র স্নেহ ঘরে ঘরে বিলিয়ে বেড়াচ্ছিস! বড় দুঃখ, তোদের সহজে কেউ চেনে না। যে হতভাগার বোন্ নেই, সেই বোঝে তার দুঃখ কষ্ট কত বড়! মুখে অনেক সময় তোদের কষ্ট দেবার ভাণ ক'রলেও তোরা বোধ হয় সহজেই বুঝিস, যে, আমাদেরও বুকে তোদেরই মত অনাবিল একটী স্নেহ-প্রীতির প্রশান্ত ধারা ব'য়ে যাচ্ছে, তাই তোরা মুখ টিপে হাসিস। আবার কাজের সময় কেমন ক'রে এত বড় তোদের স্নেহ-বেষ্টনীকে ধূলিসাৎ ক'রে দিস! . . .

আমার এই বড় গৌরবের, বড় স্নেহের বোনটীকে আশীর্ব্বাদ ক'রবার ভাষা পাই নি সে দিন। তার আনত মস্তকে শুধু দু' ফোটা তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে প'ড়ে আমার প্রাণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা জানিয়েছিল।

খুব সহজেই পরীর সঙ্গে দেখা ক'রতে গেলুম। এই

নির্ব্বিকার তৃপ্তিতে আমার নিজেরই বিস্ময় এল! কি ক'রে এমন হয়? . . .

পরী নব-বধূর বেশে এসে যখন আমার পা ছুঁয়ে সালাম ক'রলে, তখন বরষার স্রোতস্বিনীর চেয়েও দুর্ব্বার অশ্রুর বন্যা তার চোখ দিয়ে গ'লে প'ড়ছে! মুহূর্ত্তের জন্যে দুর্জ্জয় একটা ক্রন্দনের উচ্ছ্বাসে আমার বুকটা যেন খান খান হ'য়ে ভেঙে প'ড়বার উপক্রম হ'ল। প্রাণপণে আমি আমার অশ্রুরুদ্ধ কম্পিত স্বরকে সহজ সরল ক'রে তার মাথায় হাত রেখে স্নিগ্ধ-সজল কণ্ঠে ব'ললুম,—চির-আয়ুষ্মতী হও! সুখী হও।

সে শুধু স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার পর মহিমময়ী রাণীর মতই চ'লে গেল।

যখন আমার ভাঙা ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে একবার চারিদিকে শেষ-চাওয়া চেয়ে নিলুম, তখন মনে হ'ল যেন 'সজ্‌নে ফুলের হাত-ছানিতে' আমার পল্লী-মাতা আমায় ইশারায় বিদায় দিলে! একবার নদী-পারের শিমুল গাছটার দিকে চেয়ে মনে হ'ল যেন তার ডালে ডালে নিরাশ প্রেমিকের 'খুন-আলুদা' হৃৎপিণ্ডগুলো টাঙানো র'য়েছে! . . . সে দিন ছল-ছল ময়ূরাক্ষীর নির্ম্মল ধারা তেমনি মায়ের বুকের শুভ্র ক্ষীর-ধারার মতই ব'য়ে যাচ্ছিল!

স্বপ্নের মত বিহ্বলতায় ভরা সে কোন্ সুরপুর হ'তে আধ-ঘুমে গীত আধখানা গানের প্রাণস্পর্শী ব্যঞ্জনা আমার কানে এল—

"অনেক দিনের অনেক কথা ব্যাকুলতা বাঁধা বেদন-ডোরে,
মনের মাঝে উঠেছে আজ ভ'রে!"

শান্তির মত শুভ্র এক-বুক পবিত্রতা নিয়ে এই অজানার

দিকে তখন পাড়ি দিলুম। আর একটিবার আমার শূন্য ঘরটার দিকে অশ্রু-ভরা দৃষ্টি ফিরিয়ে আকুল কণ্ঠে ক'য়ে উঠলুম,—"জয় অজানার জয়!"

পরীর কথা

ময়ূরেশ্বর—বীরভূম

সব ছাপিয়ে আমার মনে প'ড়ছে তাঁরই গাওয়া অনেক আগের একটা গানের সান্ত্বনা,—

"অনেক পাওয়ার মাঝে মাঝে কবে কখন্ একটুখানি পাওয়া,
সেইটুকুতেই জাগায় দখিন্ হাওয়া,
দিনের পরে দিন চ'লে যায় যেন তারা পথের স্রোতেই ভাসা,
বাহির হ'তেই তাদের যাওয়া-আসা;
কখন্ আসে একটী সকাল সে যেন মোর ঘরেই বাঁধে বাসা,
সে যেন মোর চিরদিনের চাওয়া।
হারিয়ে-যাওয়া আলোর মাঝে কণা কণা কুড়িয়ে পেলেম যারে,
রইল গাঁথা মোর জীবনের হারে;

সেই যে আমার জোড়া-দেওয়া ছিন্ন দিনের খণ্ড আলোর মালা,
সেই নিয়ে আজ সাজাই আমার থালা।
এক পলকের পুলক যত, এক নিমিষের প্রদীপখানি জ্বালা,
একতারাতে আধখানা গান গাওয়া।"

আমার আজ সেই কথাটাই বারে বারে মনে হ'চ্ছে, যে, যাকে হারিয়ে-যাওয়া আলোর মাঝে কণা কণা ক'রে কুড়িয়ে পেলুম, সেই আমার জীবনের হারে গাঁথা রইল! আর সেই আমার জোড়া-দেওয়া ছিন্ন দিনের খণ্ড আলোর মালা নিয়ে আজ আমার দুখের থালা সাজিয়ে ব'সে আছি,—ওঃ সে বড় আশায়!—এ কোন্-সে দিনের আশায় আর কার প্রতীক্ষায়?

তিনি যখন আমায় আশীর্ব্বাদ ক'রতে এলেন, তখন একবার মনে হ'ল বুঝি এইবার আমার সকল বাঁধন টুট্‌ল! ওঃ খোদা! আমাদের বুকে তুমি রাশি রাশি ব্যথা আর দুঃখ বোঝাই ক'রে রেখেছ, তা সহ্য ক'রতে তেমনি ধৈর্য্য-শক্তি যদি আমাদের না দিতে, তা হ'লে আমাদের লজ্জা রাখ্‌বার আর জায়গা থাকত না—অপমানের চূড়ান্ত হ'ত! সে দিন আমি নিজেকে সংযত ক'রতে না পারলে আমার নারীত্বের মাথায় যে পদাঘাত প'ড়ত, তাতে আমি হয়তো আর এই আজকের মত মাথা তুলেই দাঁড়াতে পারতাম না। তুমি হৃদয়ে বল দিয়েছ প্রভু, তাই অসঙ্কোচে এমন একটা গৌরব অনুভব ক'র্‌তে পার্‌ছি আজ, হোক্ না কেন সে গৌরব বড় কষ্টের!

আমার ভালবাসাই হয়তো তাঁর কর্ত্তব্যের অন্তরায় হ'য়ে

দাঁড়িয়েছিল। তাঁর সুখের জন্যে, তাঁর তৃপ্তির জন্যে আমি কেন তবে সে-পথ হ'তে স'রে দাঁড়াব না? আমার সর্ব্বস্বের বিনিময়েও যে তাঁকে সুখী ক'রতে পেরেছি, এই তো আমার শ্রেষ্ঠ সান্ত্বনা!

এই তাঁর চিন্তাটা যে আজ হ'তে জোর ক'রে মন থেকে সরিয়ে ফেল্‌তে হবে, সেইটাই আমায় সব চেয়ে কষ্ট দিচ্ছে। বাইরের শাসন আর ভিতরের শাসন এই দু'টোয় মস্ত টানাটানি প'ড়ে গিয়েছে এখন।—সমাজ, ধর্ম্ম আমার মনকে মুখ ভাঙিয়ে চোখ রাঙিয়ে ব'লছে,—সে চিন্তাটা তোমার ভয়ানক অন্যায়, অমার্জ্জনীয় পাপ।

মনও বেশ প্রশান্ত হাসি হেসে ব'লছে,—আমি মিথ্যাকে মান্‌ব কেন? যা অন্তরের সত্য, সেইটাই আসল, সেইটাকে এড়িয়ে চ'ললেই পাপ। গভীর সমাজ-তত্ত্বের সাথে গভীর সত্যের কথাটাও একবার ভেবে দেখ।

বাস্তবিক, অন্তরের গভীর সত্যকে বরণ ক'রে নিতে গিয়ে সমাজ আর ধর্ম্মকে আঘাত করা হয় ব'লে যদি মনে করি, তা হ'লে সেটা আমাদেরই ভুল; কারণ আমরা সমাজ আর ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত আদত সত্যকে উপেক্ষা ক'রে তাদের বাইরের খোলসটাকে আঁক্‌ড়ে ধ'রে মনে করি, আমাদের মত সত্যবিশ্বাসী আর নেই। আমাদের এ অন্ধবিশ্বাস যে মিথ্যা, তা সব চেয়ে বেশী ক'রে জানি আমরা নিজেরাই। তবু সেটা আমরা কিছুতেই স্বীকার ক'র্‌ব না, উল্‌টো হাজার 'ফেচাং'-এর দলিল নজির পেশ ক'রব। কিন্তু তাই যদি হয়, তা হ'লে অন্তরের সত্যকে উপেক্ষা ক'রে এই যে আর এক জনকে আমার স্বামী ব'লে নিজ মুখে মেনে নিলাম, তার কি হবে?

মনও যেন তখন বিরক্তি-বিতৃষ্ণায় জ্ব'লে উঠে বলে,—হাঁ, একটা বড় কাজ ক'রছ ব'লে এই যে এত বড় সত্যের অবমাননা ক'রলে, তার শাস্তি খুব কঠোর নির্দ্দয়ভাবে পেতে হবে। এখন যে তাকে আর চিন্তা ক'রতেও পাবে না, এইটাই তোমার উপযুক্ত শাস্তি!

মনের এই অভিমান-ভরা উক্তিতে আমি না কেঁদে থাক্‌তে পারি নে। আমারও কেন মনে হয়, যে, আমি ইচ্ছে ক'রেই তাঁকে এড়িয়ে গিয়েছি, কিন্তু বুক-ভরা অভিমান আমার তাঁর বিরুদ্ধে এখনও জ'মে র'য়েছে! প্রিয়ের বিরুদ্ধে এ অভিমান আমার জন্মে জন্মে সঞ্চিত রইল।

কাল ছিল আমার ফুল-শয্যা। এই বাসর রাত্রিটা অনেক নারীর জীবনে মাত্র একটী নিশির জন্যই সুখদ হ'য়ে আসে। এর বিনোদ স্মৃতিটা প্রভাতের শুক্ তারার চেয়েও স্নিগ্ধ উজ্জ্বল হ'য়ে দুঃখ-বেদনা-ক্লিষ্ট নারীর জীবনে অনেকখানি আনন্দের আলো বিকীর্ণ করে।

কিন্তু এমন সুখ-নিশিতেও কি জানি কেন কিছুতেই আমার উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন রোধ ক'রতে পারছিলুম না। আমার স্বামী আমার হাত ধ'রে তুলে আর্দ্র কণ্ঠে জিজ্ঞেস ক'রলেন,—কেন কাঁদছ পরী?—ব্যথায় তাঁর স্বর আহত হ'য়ে উঠ্‌ল।

আমি বড় কষ্টে উপাধানে তেমনি ক'রে নিজের এই নির্লজ্জ চোখ দু'টোকে লুকিয়ে মনে মনে ব'ললুম,—বুকে বড়

বেদনা ! আমার হাতে তাঁর তপ্ত অশ্রু টস্ টস্ ক'রে ঝ'রে প'ড়তে লাগ্‌ল ! পুরুষ মানুষ যে কত কষ্টে এমন ক'রে কাঁদ্‌তে পারে, তা বুঝে আমার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া যেন বন্ধ হবার উপক্রম হ'ল। একটু পরেই তিনি বেশ স্নিগ্ধ সহানুভূতির স্বরে যেন আমার মনের কথাটা টেনে নিয়ে ব'ললেন,—তোমার বেদনা তো আমি জানি পরী ! তোমার এ বুক-জোড়া বেদনা কি দিয়ে আরাম ক'রতে পার্‌ব বল ? . . .

এক নিমেষে আমার লুপ্ত জ্ঞান যেন ফিরে এল। আমি সোজা হ'য়ে ব'সে ব'ললুম,—"আপনি সব জানেন ?"

তিনি করুণ হাসি হেসে ব'ললেন,—"তুমি বোধ হয় জান না, যে, আজ্‌হার আমার অনেক দিনের বন্ধু। আমরা বরাবর দু'-জনে এক সঙ্গেই প'ড়েছি। সে যাবার আগে আমায় সব ব'লেছে ! তাকে আমি বরাবরই চিনি,—সে মিথ্যা বলে না, সে শিশুর মতই সরল। তবু সকল কথা জেনেও মনে হ'চ্ছে, আমি তাকে সুখী ক'রতে গিয়েও কি যেন মস্ত অন্যায় ক'রেছি। এখন ভাবছি, যে তাকে সুখী তো ক'রতেই পারি নি, উল্টো তার দুঃখ-কষ্টকে হয়তো আরও বাড়িয়ে দিয়েছি। সে হতভাগা বোধ হয় শান্তিতেও ম'রতে পার্‌বে না ! এই আমার জীবনে প্রথম আর শেষ অন্যায়। সে আমার পা ধ'রে মুক্তি চেয়েছিল। তখন কিন্তু বুঝি নি, সে কোন্ মুক্তি !—আমার সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা ক'রেছি পরী, কিন্তু এতে আত্মতৃপ্তির চেয়ে আত্মগ্লানিই বেশী ক'রে পেলুম , কেননা আমার অবস্থাটা এখন সেই রকমের হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, যারা সবাইকে সন্তুষ্ট ক'রতে চায়, অথচ কাউকেই সন্তুষ্ট ক'রতে পারে না ! . . .

আজ্‌হার প্রতিজ্ঞা ক'রেছে, যে, এই কথাটা তার জীবনে আর দ্বিতীয় বার মুখ দিয়ে বেরুবে না, আর তার সত্যে আমার বিশ্বাসও আছে। সে তোমাকে সুখী ক'রবার জন্যে আমায় অনুরোধ ক'রেছে! বল পরী, তুমি কিসে সুখী হবে?" . . .

আমি তাঁর পায়ে হুম্‌ড়ি খেয়ে প'ড়ে ব'ললুম,—"তুমি আমায় এক বিন্দু ছেড়ে থেকো না, তোমার এই পায়ে এম্‌নি ক'রে মুখ গুঁজে প'ড়ে থাকতে দিও! আমার বড় কষ্ট!"

অনেক ক্ষণ পাথরের মত নিশ্চল হ'য়ে ব'সে থেকে তিনি আমায় বুকে তুলে নিয়ে ব'ললেন,—"না পরী, পায়ে কেন, এই বুকে ক'রে রাখ্‌ব!" এমন রত্ন সে হতভাগা কি ক'রে জান্‌ ধ'রে আমায় বিলিয়ে দিতে পার্‌ল, তাই ভাবছি!" ব'লেই হেসে উঠলেন।

এক মুহূর্ত্তে এই সোজা লোকটীর সরলতায় আমার বুক বেদনায় আর শ্রদ্ধায় আলোড়িত হ'য়ে উঠল। তবু মনে মনে না ব'লে পারলুম না, যে, এমন ক'রে বিলিয়ে দিতে গেলে যে, বড্ডো বেশী ভালবাসতে হয় আগে, এ ক্ষমতা কি যার-তার থাকে? আবার কি মনে ক'রে তিনি আমায় ব'লে উঠলেন,— "যা হ'য়ে গেছে, তার জন্যে খাম্‌খা লজ্জিত হ'য়ো না পরী। বীর সে, দেশের কাজে গিয়েছে; তাকে আর ডেকো না। মনে কর, যা হ'য়ে গেছে, তা শুধু ঘুমের ঘোরে!" ব'লেই তিনি আবার মাথাটা জোর ক'রে তুলে সুর ক'রে গাইতে লাগলেন,—

"সধবা অথবা বিধবা তোমার রহিবে উচ্চ শির,
উঠ বীরজায়া বাঁধো কুন্তল মুছ এ অশ্রু-নীর।"

এ কি রহস্য খোদা! . . . এ দেবতাকে যেন কোন দিন প্রতারণা করি না, এই শক্তি দাও; হৃদয়ে এমনি বল দাও; এখন শুধু শিশুর মত ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে ক'রছে আমার। শান্তি দাও খোদা, শান্তি দাও এঁকে—তাঁকে, আর এম্‌নি ব্যথিত বিশ্ববাসীকে! . . .

আহা ভালবাসা দিয়ে যারা ভালবাসা পায় না, তাদের জীবন বড় দুঃখের, বড় যাতনার। আবার এই জন্যে সেটা এত যাতনার যে, ঐ না-ভালবাসাব দরুণ কাউকে অভিযোগ ক'রবারও নেই। জোর ক'রে তো আর কাউকে ভালবাসানো যায় না!

আমি কি আবার ভালবাস্‌তে পারব গো? কি ক'রে ভুল্‌ব? যে বিদায় নিয়ে এমন ক'রে জয়ী হ'য়ে চ'লে গেল, তাকে যে সারা জীবনেও কিছুতেই ভোলা যায় না! তিনি যদি আমার সাম্‌নে থেকে অন্য কোন দিকে জীবনটা সার্থক ক'রে তুলতেন, তা হ'লে হয়তো তাকে ভুলতেও পারতাম। সব হারিয়ে যে এমন-জীবনটা ব্যর্থ ক'রে দিলে এই হতভাগিনীর জন্যে, হায়! তাকে কি ভোলা যায়? নারীর ভালবাসা কি এত ছোট?

ঐ যে এখনও আমার স্বামী তেম্‌নি হাসিমুখে গাচ্ছেন,—

"ওগো দেখি আঁখি তুলে চাও,
তোমার চোখে কেন ঘুম-ঘোর!"

অতৃপ্ত কামনা

'আত্মশক্তি' বলেন,—

"কাজী নজরুল ইস্‌লামকে আমরা প্রতিভাবান্ নবীন কবি বলিয়াই জানিতাম। তাঁহার এই বইখানি পড়িয়া বুঝিলাম যে, গল্প-সাহিত্যেও তিনি সমান কৃতী।"

* * *

"আমার এত দিনের দূর ছিল না সত্যিকারের দূর,
ওগো আমার সুদূর ক'রত নিকট ঐ পুরাতন পুর !
এখন তোমার নতুন বাঁধন,
নতুন হাসি, নতুন কাঁদন,
নতুন সাধন, গানের মাতন
নতুন আবাহনে।
আমারই সুর হারিয়ে গেল সুদূর পুরাতনে।

সখি ! আমার আশাই দুরাশা আজ, তোমার বিধির বর।
আজ মোর সমাধির বুকে তোমার উঠবে বাসর-ঘর !
শূন্য ভ'রে শুনতে পেনু
ধেনু-চরা বনের বেণু—
হারিয়ে গেনু হারিয়ে গেনু
অস্ত-দিগঙ্গনে।
বিদায় সখি, খেলা-শেষ এই বেলা-শেষের ক্ষণে !
এখন তুমি নতুন মানুষ নতুন গৃহ-কোণে।"

—দোলন-চাঁপা—

* * *

অতৃপ্ত কামনা

সাঁঝের আঁধারে পথ চ'লতে চ'লতে আমার মনে হল, এই দিনশেষে যে হতভাগার ঘরে একটী প্রিয় তরুণ মুখ তার 'কালো চোখের করুণ কামনা' নিয়ে সন্ধ্যাদীপটী জ্বেলে' পথের পানে চেয়ে থাকে না, তার মত অভিশপ্ত বিড়ম্বিত জীবন আর নেই!

আমারই বেদনা-রাগে রঞ্জিত হ'য়ে গগনের পশ্চিম দুয়ারে জ্বালা সন্ধ্যা-তারা আমার মুখে তার অশ্রু-ভরা ছল-ছল চোখ দিয়ে চেয়ে ঐ কথাটীতে সায় দিলে। ঝিল্লী-তান-মুখরিত মাঠের মৌন পথ বেয়ে যেতে যেতে শ্রান্ত চিন্তা ক'য়ে গেল,—"তোমার ব্যথা বোঝে শুধু ঐ এক সাঁঝের তারা!"

যদি কোন ব্যথাতুর একটী পল্লী হ'তে আর একটী পল্লীতে যেতে এমনি সাঁঝে একা শূন্য মাঠের সরু রাস্তা ধ'রে চ'লতে থাকে—আর তার সাম্‌নে এক টুক্‌রো টাট্‌কা কাটা-ক'ল্‌জের মত এই সন্ধ্যাতারাটী ফুটে ওঠে,

তবে সেই বুঝ্‌বে কত বুক-ফাটা ব্যথা সে-সময় তার মনে হ'য়ে তাকে নিপীড়িত ক'রতে থাকে।

এই মলিন মাঠের শূন্য বুকে কিচ্ছু শোনা যাচ্ছে না, শুধু কোথায় সান্ধ্য নীড়ে ব'সে একটী 'ধূলো-ফুরফুরি' শিশ্‌ দিয়ে দিয়ে বাউল গান গাইছে, আর তারই সূক্ষ্ম রেশ্‌ রেশ্‌মী সূতোর মত উড়ে এসে আমার আনমনা-মনে ছোঁওয়া দিচ্ছে। একটী দু'টী ক'রে আস্‌মানের আঙিনায় তারা এসে জুট্‌ছে, আমার মনের মাঝেও তাই অনেক দিনের অনেক সুপ্ত কথার, অনেক লুপ্ত স্মৃতির একটীর পর একটীর উদয় হ'চ্ছে। . . .

আমার এই একই কথা, একই ব্যথা যে কত দিক্‌ দিয়ে কত রকমে মনে প'ড়ছে, তার আর সংখ্যা নেই। তবু বারে বারে ও-কথাটী, ও-ব্যথাটী জাগবেই। মন আমার এ বেদনার নিবিড় মাধুর্য্যকে আর এড়িয়ে যেতে পারলে না সাপ যেমন মাণিক ছেড়ে তার সেই মাণিকটুকুর আলোর বাইরে যেতে পারে না, আমারও হ'য়েছে তাই। আমার এই বুকের মাণিকটুকুর অহেতুক অভিমানের মায়া এড়িয়ে যেতে পারলাম না।

অনেক দূরে হাটের ফেরতা কোন্‌ ব্যথিতা পল্লী-বধূ মেঠো-সুরে মাঠের বিজন পথে গেয়ে যাচ্ছিল,—

"পরের জন্যে কাঁদ রে আমার মন,
হায়, পর কি কখন হয় আপন?"

আমি মনে মনে ব'ললাম—হয় রে অভাগী, আপন হয়; তবে অনেকে সেটা বুঝতে পারে না। বুকের ধনকে ছেড়ে

গেলেই লোকে ভুল বুঝে বলে,—"পর কি কখন হয় আপন ?" আর এক জনও ঠিক এম্‌নি ক'রে আমায় ছেড়ে গেছে. সে বেদনা ভুলবার নয়।

পথের বিরহিণীর ঐ প্রাণের গান আমায় মনে করিয়ে দিলে অম্‌নি আর এক জন অভিমানিনীর কথা। সেই দিল্‌-মাতানো স্মৃতিটী মাঝিহারা ডিঙির মত আমার হিয়ার যমুনায় বারে বারে ভেসে উঠ্‌ছে

তাতে-আমাতে পরিচয় তো শুধু ছেলে-বেলা থেকে নয়—তারও অনেক আগে থেকে ; সেই চিরপরিচয়ের দিন তারও মনে নেই, আমারও মনে নেই। . . .

আমাদের পাড়াতেই তাদের বাড়ী।

তাকে আমার বিশেষ ক'রে দরকার হ'ত সেই সময়, যখন কাউকে মার্‌বার জন্যে আমার হাত দু'টো ভয়ানক নিশ্‌-পিশ্‌ ক'রে উঠ্‌ত। এ-মারারও আবার বিশেষত্ব ছিল ; যখন মারবার কারণ থাকৃত, তখন তাকে মারতাম না ; কিন্তু বিনা কারণে মারাটাই ছিল আমার ক্ষেপা-খেয়াল। আমার এ-পিটুনী খাওয়াটাকে সে পসন্দ ক'রত কি না জানি নে, তবে দু'দিন না মারলে সে আমার কাছে এসে হেসে ব'লত,—কই ভাই, এ দু' দিন যে আমায় মা

আমি কষ্ট পেয়ে ব'লতাম,—না রে মোতি, তোকে আর মারব না। তার পর, সে সময় আমার হাতের সামনে যা-কিছু ভাল জিনিস থাকৃত, তাই তাকে দিয়ে যেন আমার প্রাণে গভীর তৃপ্তি আস্‌ত। মনে হ'ত, এই নিয়ে হয়তো আমার আঘাতটাকে ভুলবে।

বই থেকে ছবি ছিঁড়ে তাকে দেওয়াই ছিল আমার সব-চেয়ে মূল্যবান উপহার! এর জন্যে প্রায়ই পাঠশালায় সারা দিন কান ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ত। কিন্তু যখন দেখতাম, যে, আমার দেওয়া ঐ মহা উপহার সে পরম আগ্রহে আঁচলের আড়াল ক'রে নিয়ে গিয়ে তার পুতুলের বিছানা পেতে দিয়েছে, কিংবা তার খেলা-ঘরের দেওয়ালে ভাত দিয়ে সেগুলি এঁটে দিয়েছে, তখন আমার পাঠশালার সব অপমান ভুলে যেতাম। কিন্তু তার ঐ মেনী বেড়ালটাকে আমি ছু' চোখে দেখ্‌তে পার্‌তাম না। তাকে যে অত আদর ক'রবে রাত-দিন, এ যেন আমার সইত না। সে আমায় রাগিয়ে তুল্‌বার জন্যে কোন দিন আমার-দেওয়া সব চেয়ে ভাল ছবিটা আঠা দিয়ে ঐ মেনী বিড়াল-ছানাটার পিঠে এঁটে দিত, আমিও তখন থাপ্পড়ের চোটে তার ছুলালী বেড়াল-বাচ্ছাকে ত্রি-ভুবন দেখিয়ে দিতাম।

তার দেখা-দেখি আমিও সময় বুঝে যে দিন সে রেগে থাক্‌ত বা মুখখানা হাঁড়ি-পানা ক'রে ব'সে থাক্‌ত, তখন জোর ধুম্‌সুনী দিয়ে তাকে কাঁদিয়ে ছাড়তাম। তখন আমার আনন্দ দেখে কে! সে যত কাঁদত, আমি তত মুখ ভাঙিয়ে তাকে কাঁদিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাস্‌তাম। এক এক দিন তার পিঠের চামড়ায় পাঁচটা আঙুলের কালো দাগ ফুটিয়ে তবে ছাড়তাম। আশ্চর্য্য হ'য়ে দেখতাম, ঐ মার খাওয়ার পরেই সে বেশ শায়েস্তা হ'য়ে গেছে; আর এক মিনিটে কেমন ক'রে সব ভুলে গিয়ে জল-ভরা চোখে-মুখে প্রাণ-ভরা হাসি এনে আমার আঙুলগুলো টেনে মুচড়িয়ে ফুটিয়ে দিতে দিতে ব'লছে,—

তোমার এই মারহাট্টা হাতের দুষ্টু আঙুলগুলোকে একেবারে ভেঙে নূলো ক'রে দিতে হয়! তা হ'লে দেখি, তোমার ঐ ঠুঁটো হাত দিয়ে কেমন ক'রে আমায় মার!

তার হাসি দেখে রেগে পিঠের ওপর মস্ত একটা লাথি মেরে ব'লতাম,—তা হ'লে এমনি ক'রে তোর পিঠে ভাদুরে' তাল ফেলাই।

সে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে তার দাদিজিকে ব'লে দিত গিয়ে এবং তিনি যখন চেলা-কাঠ নিয়ে আমায় জোর তাড়া ক'রতেন, তখন সে হেসে একেবারে লুটিয়ে প'ড়ত। রাগে তখন আমার শরীর গশ্‌ গশ্‌ ক'রত! তাই আবার ফাঁকে পেলেই তাকে পিটিয়ে দোরস্ত ক'রে দিতাম।

কোন দিন বা তার খেলা-ঘরের সব ভেঙে-চুরে একাকার ক'রে দিতাম, এই দিন সে সত্যি-সত্যি ক্ষেপে গিয়ে আমার পিঠে হয়তো মস্ত একটা লাঠির ঘা বসিয়ে দিন পনেরো ধ'রে লুকিয়ে থাক্‌ত, ভয়ে আর কিছুতেই আমার সামনে আস্‌ত না। সেই সময়টা আমার বড্ডো দুঃখ হ'ত। আ মলো, ও-লাঠির বাড়িতে আমার এ মোষ-চামড়ার কি কিছু হয়? আর লাগলই বা! তাই ব'লে কি বাঁদ্‌রী এমন ক'রে লুকিয়ে থাকবে? তার পর যখন নানান্‌ রকমের দিব্যি ক'রে কসম খেয়ে ফুস্‌লিয়ে তাকে ডেকে আন্‌তাম, তখন সে আমার লম্বা চুলগুলো নিয়ে নানান্‌ রকমের বাঁকা সোজা সিঁথি কেটে দিতে দিতে ব'লত,—দেখ ভাই, আর আমি কখ্‌খনো তোমায় মারব না। যদি মারি তো আমার হাতে যেন কুঠ হয়, পোকা হয়।

তার পরে হঠাৎ ব'লে উঠ্‌ত,—আচ্ছা ভাই, তুমি যদি

আমার মতন বেটী ছেলে হ'তে, তা হ'লে বেশ হ'ত,—নয় ?—দাও না ভাই, তোমার চুলগুলো আমার ফিতে দিয়ে বেঁধে দিই। কোন দিন সে সত্যি-সত্যিই কখন্ কথা কইতে কইতে দুষ্টুমী ক'রে চুলে এমন বিউনী গেঁথে দিত, যে, তা ছাড়াতে আমার একটী ঘণ্টা সময় লাগত। . . .

তার পর কি হ'ল ? . . .

এই শূন্য মাঠের খানিকটা রাস্তা পেরিয়েই আমার মনের শাশ্বত শ্রোতা জিগ্‌গেস্ ক'রে উঠ্‌ল,—হাঁ ভাই, তার পর কি হ'ল ?

আমার হিয়ার কথক কিছুক্ষণ এই নিঝুম সাঁঝের জমাট নিস্তব্ধতার মাঝে যেন তার কথা হারিয়ে ফেল্‌লে। হঠাৎ এই নীরবতাকে ব্যথিয়ে সে ক'য়ে উঠ্‌লো,—না—না, তোমায় আমি ভালবাসি। সে দিন মিথ্যা ক'য়েছিলাম মোতি, মিথ্যা ক'য়েছিলাম। তার এই খাপ্‌ছাড়া আক্ষেপ সাঁঝের বেলাও তোড়ি রাগিণী আলাপের মত যেন বিষম বে-সুরো বাজ্‌লো ! সে আবার স্থির হ'য়ে তার সুর-বাহারে পূরবীর মূর্চ্ছনা ফোটালে। চির-পিয়াসী আমার চিরন্তন তৃষিত আত্মা প্রাণ ভ'রে সে সুর-সুধা পান ক'রতে লাগ্‌ল !

এমনি ক'রেই আমাদের দিন যাচ্ছিল। সে যখন এগারোর কাছা-কাছি, তখন তাকে জোর ক'রে অন্দরমহলের আঁধার কোণে ঠেসে দেওয়া হ'ল

সে কি ছট্‌ফটানী তখন তার আর আমার ! মনে হ'ল এই বুঝি আমার জীবন-স্রোতের ঢেউ থেমে গেল। স্রোত যদি তার তরঙ্গ হারায়, তবে তার ব্যথা সে নিজেই বোঝে

বাঁধ-দেওয়া প্রশান্ত দীঘির জল তার সে বেদন বুঝবে না। মুক্তকে যখন বন্ধনে আনবার চেষ্টা করা হয়, তখনই তার তরঙ্গের কল্লোলে মধুর চল-চপলতার কলহ-বাণী ফুটে ওঠে। তাই এ-রকমের চলার পথে বাধা পেয়েই আমাদের সহজ ঢেউ বিদ্রোহী হ'য়ে মাথা তুলে সাম্‌নের সকল বাধাকে ডিঙিয়ে যেতে চাইলে। চির-চঞ্চলের প্রাণের ধারা এই চপল গতিকে থামাবে কে? পথের সাথী আমার হঠাৎ তার চলায় বাধা পেয়ে বক্র-কুটিল গতি নিয়ে তার সাথীকে খুঁজতে ছুট্‌ল। এত দিনে যেন সে তার প্রাণের ঢেউ-এর খবর পেলে। . . .

সর্ব্বক্ষণ কাছে পেয়ে যাকে সে পেতে চেষ্টা করে নি, সে দূরে স'রে এই দূরত্বের ব্যথা, ছাড়া-ছাড়ির বেদনা তার বুকে প্রথম জেগে উঠতেই সে তাকেচিন্‌ল এবং ব'লে উঠ্‌ল—যাকে চাই তাকে পেতেই হবে।

বঞ্চিত স্নেহের হাহাকার, ছিন্ন বাসনার আকুল কামনা তার বুকে উদ্দাম উন্মাদনা জাগিয়ে দিয়ে গেল। তখন সে তা'র এই আকাঙ্খিত আশ্রয়কে নতুন পথে নতুন ক'রে খুঁজতে লাগ্‌ল। সে অন্তরে বুঝলে, এ সাথী না হ'লে আমি আমার গতি হারাব। এই রকম মুক্তি আর বন্ধনের যুঝাযুঝির মাঝে প'ড়ে সে কাহিল হ'য়ে উঠ্‌ল! সমাজ ব'ললে—রাখ্‌ তোর এ মুক্তি—আমি এই দেওয়াল দিলাম।

সেই দেওয়ালে মাথা খুঁড়ে রক্ত-গঙ্গা বহালে, পাষাণের দেওয়াল—ভাঙতে পারলে না।

এ-দিকে আমাকে কেউ রাখতে পার্‌লে না। লোকের

চলার উল্টো পথে উজান বেয়ে চলাই হ'ল আমার কাজ। অনেক মারামারি ক'রে যখন আমাকে স্কুলের খাঁচায় পুর্‌তে পার্‌লে না, তখন সবাই ব'ললে,—এ ছেলের যদি লেখা-পড়া হয়, তবে সুগ্রীব-সহচর দগ্ধমুখ হনুবংশ কি দোষ ক'রেছিল? তা'রাও হা'ল ছেড়ে দিলে, আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে দেখলাম, এই বাধার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রতে গিয়ে যত তাকে ভুলে র'য়েছি, ততই যেন সে আমার একান্ত আপনার হ'য়ে আমার নিকটতম কাছে এসে আমার ওপর তার সব নির্ভরতা স'পে গেছে।

যমুনা আস্‌ছিল সাগরের পানে, ঐ সাগরও তার দিগন্ত-ছোঁওয়া ঢেউ-এর আকুলতায় লক্ষ বাহুর ব্যগ্রতা নিয়ে তার দিকে ছুটে যেতে চাইল! দু'জনেই অধীর হ'য়ে প'ড়েছিল এই ভেবে—হায়, কবে কোন্ মোহানায় তাদের চুমোচুমি হবে, তারা এক হ'য়ে যাবে! . . .

আর আমাদের দেখা-শোনা হ'ত না। কথা যা হ'ত, তা কখনও সবাইকে লুকিয়ে ঐ একটী চোরা-চাওয়ায়, নয়তো বাতায়নের ফাঁক দিয়ে দু'টী তৃষিত অতৃপ্ত দৃষ্টির বিনিময়ে। ঐ এক পলকের চাওয়াতেই যে আমাদের কত কথা শুধানো হ'য়ে যেত, কত ব্যথা-পুলক শিউরে উঠ্‌ত, তা ঠিক বোঝানো যায় না।

আরও পাঁচ বছর পরের কথা! . . .

এক দিন শুন্‌লাম তার বিয়ে হবে, মস্ত বড় জমিদারের ছেলে বি-এ পাশ এক যুবকের সাথে। বিয়ে হওয়ার পর সে শ্বশুর-বাড়ী চ'লে যাবে, তার সাথে আমার এই চোখের চাওয়াটুকুও ফুরাবে, এই ব্যথাটুকুই বড় গভীর হ'য়ে মর্ম্মে আমার দাগ কেটে ব'সে গেল! এ ব্যথার প্রগাঢ় বেদনা আমার বুকের ভিতর যেন পিশে পিশে দিয়ে যেতে লাগ্‌ল। কিন্তু যখন মেঘ-ছাড়া দীপ্ত মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের মত সহসা এই কথাটা আমার মনে উদয় হ'ল, যে, সে সুখী হবে, তখন যেন আমি আমার নতুন পথ দেখ্‌তে পেলাম। ব'ললাম,—না—আমি জন্মে কারুর কাছে মাথা নত করি নি, আজও আমাকে জয়ী হ'তে হবে! আর দুঃখই বা কিসের? সে ধনী শিক্ষিত সুন্দর যুবকের অঙ্কলক্ষ্মী হবে, অভাগী মেয়েদের সুখী হবার জন্যে যা-কিছু চাওয়া যায় তার সব পাবে; কিন্তু হায়, তবু অবুঝ মন মানে না! মনে হয়, আমার মতন এত ভালবাসা তো সে পাবে না!

এই কথা ক'টা ভাব্‌তে গিয়ে আমার বুক কান্নায় ভ'রে এল,—আমার যে বাইরের দীনতা তাই মনে প'ড়ে তখন আমাকে আমার অন্তরের সত্য-প্রেমের গৌরবের জোরে খাড়া হ'তে হ'ল।—এক অজানার ওপর তীব্র অভিমানের আক্রোশে ব'ললাম,—নিজের সুখ বিলিয়ে দিয়ে এর প্রতিহিংসা নেবো। ত্যাগ দিয়ে আমার দীনতাকে ভ'রে তুল্‌ব।

এত দ্বন্দ্বের মাঝে "আমার প্রিয় সুখী হবে" এই কথাটির গভীর তত্ত্ব প্রাণে আমার ক্রমেই কেটে কেটে ব'সতে লাগ্‌ল,

তার পর হঠাৎ এক সময় আমার বুকের সব ঝঞ্ঝা ঝড় বেদনা-তরঙ্গ ধীর শান্ত স্তব্ধ হ'য়ে গেল! বিপুল পবিত্র সান্ত্বনায় তিক্ত মন আমার যেন সুধাসিক্ত হ'য়ে গেল! আঃ! কোথায় ছিলে এত দিন ওগো বেদনার আরাম আমার? এত দিন পরে নিশ্চিন্ততার কান্না কেঁদে শান্ত হ'লাম!

এ কোন্ অর্ফিয়াসের বাঁশীর মায়া-তান, এমন ক'রে আমার মনের দুরন্ত সিন্ধুকে ঘুম পাড়িয়ে গেল? . . . হায়, এত দিন বাঁশীর এই যাদু-করা সুর কোথায় ছিল? . . .

সে দিন নিশীথ রাতে তার বাতায়নের পানে চেয়ে তাই গেয়েছিলাম,—

"আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই
বঞ্চিত করে' বাঁচালে মোরে!
এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর
জীবন ভরে'।" . . .

বাঃ, এরই মধ্যেই দেখ্‌ছি মাঠের সারা পথটা পেরিয়ে গাঁয়ের সীমা-রেখার কাছা-কাছি এসে প'ড়েছি। দূর হ'তে ঘরে ঘরে মাটীর আর কেরোসিনের যে ধোঁওয়া-ভরা দীপের আভাস পাওয়া যাচ্ছে, তাতেই আমার মন কেমন ঐ প্রদীপ-জ্বালা ঘরের দিকে আকৃষ্ট হ'চ্ছে। মনে হ'চ্ছে, ঐ দীপের পাশে ঘোম্‌টা-পরা একটী ছোট মুখ হয়তো তার দু' চোখ-ভরা আকুল প্রতীক্ষা নিয়ে পথের পানে চেয়ে আছে। দখিন হাওয়ায় গাছের একটী পাতা ঝ'রে প'ড়লে অম্‌নি সে চ'ম্‌কে উঠ্‌ছে—ঐ গো বুঝি তার প্রতীক্ষার ধন এল! তার বুকে এই রকম

আশা-নিরাশার যে একটা নিবিড় আনন্দ ঘুরপাক খাচ্ছে, তার নেশায় সে মাতাল!

আমার মনের সেই চিরকেলে অক্লান্ত বিরহী শ্রোতা তাড়া দিয়ে ক'য়ে উঠ্‌লো,—ও সব পরে ভেবো 'খন, তার পর কি হ'ল, বল!

তখন গাঁয়ের মাথায় মায়ের নত আঁখির স্নেহ-চাওয়ার মত নিবিড় শান্তি নেমে এসেছে। করুণ বেদনার সাথে পবিত্র স্নিগ্ধতা মিশে আমার নয়ন-পল্লব সিক্ত ক'রে আনলে।

জল-ভরা চোখে আমার বাকী কথাটুকু মনে প'ড়লো। . . .

তার বিয়ের দিন-কতক আগের এক রাতে তাতে আমাতে প্রথম ও শেষ গোপন-দেখা-শোনা! সে ব'ললে,—এ বিয়েতে কি হবে ভাই?

আমি ব'ললাম,—তুমি সুখী হবে!

সে আমার সহজ কণ্ঠ শুনে তার বয়সের কথা, আমার বয়সের কথা—আমাদের ব্যবধানের কথা সব যেন ভুলে গেল। মাথার ওপর আকাশ-ভরা তারা মুখ টিপে হেসে উঠ্‌ল। সে আবার তেম্‌নি ক'রে সেই ছেলে-বেলার মত আমার হাতের আঙুলগুলি ফুটিয়ে দিতে দিতে ব'ললে,—তা কি ক'রে হবে? তোমাকে যে ছেড়ে যেতে হবে, তোমাকে যে আর দেখ্‌তে পাব না!

এত দিনে তার এই নতুন রকমের আর্দ্র কণ্ঠের বাণী শুন্‌লাম! তার টানা টানা চোখের ঘন দীর্ঘ পাতায় তারার ক্ষীণ আলো প্রতিফলিত হ'য়ে জানিয়ে দিল, সে কাঁদ্‌ছে।

আমি ব'ললাম,—তোমার কথা বুঝ্‌তে পেরেছি মোতি! কিন্তু তুমি যার কাছে যাবে, সে তোমায় আমার চেয়েও বেশী

ভালবাসবে; আর তুমি সেখানে গিয়ে আমাদের সব কথা ভুলে যাবে!

অন্যে আমার প্রিয়কে আমার চেয়েও বেশী ভালবাসবে, এই চিন্তাটাও যেন অসহ্য! তার স্বামী আমার চেয়ে ধনী হোক, সুন্দর হোক, শিক্ষিত হোক, কিন্তু আমার চেয়ে বেশী ভালবাসবে আমার ভালবাসার মানুষটীকে, বড় অভিমানেই ঐ কথাটা আমি ব'ললাম, কিন্তু এ কথাটা ব'লেই এবার আমারও যেন বিপুল কান্না কণ্ঠ ফেটে বেরিয়ে আসতে লাগ্‌ল! সে কান্না রুধ্‌বার শক্তি নেই—শক্তি নেই! মূর্চ্ছাতুরার মত সে আমার হাতটা নিয়ে জোরে তার চোখের ওপর চেপে ধ'রে আর্ত্ত কণ্ঠে ক'য়ে উঠ্‌ল,—না—না—না! কিসের এ 'না'?

আমি তীব্র কণ্ঠে ক'য়ে উঠ্‌লাম,—এ হ'তেই হবে মোত্তি, এ হ'তেই হবে! আমায় ছাড়তেই হবে!

তখন এক অজানা দেবতার বিরুদ্ধে আমার মন অভিমানে আর তিক্ততায় ভ'রে উঠেছে! সে ভূমিতে লুটিয়ে প'ড়ে ক'য়ে উঠ্‌ল,—ওগো, চিরদিন তো আমায় মেরে এসেছ, এখনো কি তোমার মেরে সাধ মেটে নি? তবে মারো, আরও মারো—যত সাধ মারো!

কত দিনের কত কথা কত ব্যথা আমার বুকের মাঝে ভ'রে উঠ্‌ল! তার পরেই তীব্র তীক্ষ্ণ একটা অভিমানের কঠোরতা আমায় ক্রমেই শক্ত ক'রে তুলতে লাগ্‌ল! মন ব'ললে—জয়ী হ'তেই হবে!

আমি ক্রূর হাসি হেসে মোতিকে ব'ললাম,—হুঁ। কিছুতেই মান্‌বে না তো, তবে সত্যি কথাটাই বলি,—মোতি, তোমায় যে আমি ভালবাসি না।

কথাটা তার চেয়ে আমার বুকেই বেশী বাজল! সে তীরবিদ্ধা হরিণীর মত চ'ম্‌কে উঠে ব'ললে,—কি?

আমি ব'ললাম,—তোমায় এত দিন শুধু মিথ্যা দিয়ে প্রতারিত ক'রে এসেছি মোতি, কোন দিন সত্যিকার ভালবাসিনি।

আমার কণ্ঠ যেন শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেল। আহত ফণিনীর মত প্রদীপ্ত তেজে দাঁড়িয়ে যেন গর্জ্জন ক'রে উঠ্‌ল,—যাও, চ'লে যাও—তোমায় আমি চাই নে, স'রে যাও! তুমি জল্লাদের চেয়েও নিষ্ঠুর বে-দিল্!—যাও, স'রে যাও! তোমার পায়ে পড়ি চ'লে যাও, আর আমার ভালবাসার অপমান ক'রো না!

দু' চোখ হাত দিয়ে টিপে কাল-বৈশাখীর উড়ো ঝঞ্ঝার মত উন্মাদ বেগে সে ছুটে গেল! আমি টাল খেয়ে মাথা ঘুরে প'ড়তে প'ড়তে শুনতে পেলাম আর্দ্র-গভীর আর্ত্তনাদের সঙ্গে বিয়ে-বাড়ীর ছাল্‌না-বাঁধা আঙিনায় কে দড়াম্ ক'রে আছ্‌ড়ে প'ড়ে গোঙিয়ে উঠ্‌ল,—মা—গো!

ঐ—যে অনেক দূরের খেয়া-পারের ক্লান্ত মাঝির মুখে

পরিশ্রান্ত ক্লান্ত মনের চিরন্তন কান্নাটী ফুটে উঠ্‌ছে, ও যেন আমারই মনের কথা,—

"মন-মাঝি তোর বৈঠা নে রে,
আমি আর বাইতে পার্‌লাম না।"

ওগো আমার মনের মাঝি, আমারও এ ক্লান্তি-ভরা জীবন-তরী আর যে বাইতে পারি নে ভাই! এখন আমায় কূল দাও, না হয় কোল দাও!

আমার মনে বড় ব্যথা র'য়ে গেল, সে হয়তো আমার ব্যথা বুঝ্‌লে না! যাকে ভালবাসি, তাকে ব্যথা দিতে গিয়ে আমার নিজের বুক যে ব্যথার আঘাতে বেদনার কাঁটায় কত ছিন্ন-ভিন্ন, কি রকম ঝাঁঝ্‌রা হ'য়ে গেছে, হায়, তা যদি সে জান্‌ত—তা যদি মোতি বুঝতে পার্‌ত! ওঃ, যাকে ভালবাসি সেও যদি আমাকে ভুল বোঝে, তবে আমি বাঁচি কি নিয়ে? আমার এ রিক্ত জীবনের সার্থকতা কি? হায়, দুনিয়ায় এর মত বড় বেদনা বুঝি আর নেই!

এই তো আমার গাঁয়ের আম-বাগানে এসে ঢুকেছি। ঐ তো আমার বন্ধ-করা আঁধার ঘর। চারি পাশে দীপ-জ্বালানো কোলাহল-মুখরিত স্নেহ-নিকেতন, আর তারই মাঝে আমার বিজন আঁধার কুটীর যেন একটা বিষ-মাখা অভিশাপ-শেলের মত

জেগে র'য়েছে। দিনের কাজ শেষ ক'রে বিনা-কাজের সেবা হ'তে ফিরে ঘরে ঢুক্‌বার সময় রোজ যে কথাটী মনে হয়, বন্ধ দুয়ারের তালা খুল্‌তে খুল্‌তে আজও সেই কথাটীই আমার মনের চির-ব্যথার বনে দাবানল জ্বালিয়ে যাচ্ছে।

একে একে সব ঘরেই প্রদীপ জ্ব'লবে, শুধু আমার একা ঘরেই আর কোন দিন সন্ধ্যা-দীপ জ্ব'লবে না! সেই ম্লান দীপ-শিখাটীর পাশে আমার আসার আশায় কোন কালো চোখের করুণ-কামনা ব্যাকুল হ'য়ে জাগবে না!

বাইরে আমার ভাঙা দরজায় উতল হাওয়ার শুধু একরোখা বুক-চাপড়ানী আর কারবালা-মাতম রণিয়ে উঠ্‌ল,—

"হায় গৃহহীন, হায় পথবাসী, হায় গতি-হারা!"

আমার হিয়ার চিতার চিরন্তনী ক্রন্দসীও সাথে সাথে কেঁদে উঠ্‌ল,—

"হায় গৃহহীন, হায় পথবাসী, হায় গতি-হারা!"

রাজ-বন্দীর চিঠি

* * *

"তোমার কাছে নাই অজানা কোথায় আমার ব্যথা বাজে।
ওগো প্রিয়! তবু এত ছল করা কি তোমার সাজে?
কেন তোমার অনাদরে বক্ষ আমার ডুক্‌রে ওঠে,
চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ে, কলজে ছিঁড়ে রক্ত ছোটে,
এ অভিমান ব্যথাটী মোর
জানি, জান হে মনোচোর,
তবু কেন এমন কঠোর
বুঝতে পারি না যে!
অনুহেলা না পুলক-লাজে॥

যখন ভাবি আমার আদর কতই তোমায় হানে বেদন,
বুকের ভিতর আছ্‌ড়ে' পড়ে অসহায়ের হুতাশ রোদন;
যতই আমায় সইতে নার,
আঁকড়ে ততই ধরি আরো;
মারো প্রিয় আরো মারো,
তোমার আঘাত চিহ্ন রাজে
কেন আমার বুকের মাঝে॥"

—দোলন-চাঁপা-

* * *

বিদ্রোহী-কবি নজরুল ইসলাম

রাজ-বন্দীর চিঠি

প্রেসিডেন্সী জেল, কলিকাতা

মুক্তি-বার, বেলা-শেষ

প্রিয়তমা মানসী আমার !

আজ আমার বিদায় নেবার দিন। এ'কে এ'কে সকালেরই কাছে বিদায় নিয়েছি! তুমিই বাকী! ইচ্ছা ছিল, যাবার দিনে তোমায় আর ব্যথা দিয়ে যাব না, কিন্তু আমার যে এখনও কিছুই বলা হয় নি! তাই ব্যথা পাবে জেনেও নিজের এই উচ্ছৃঙ্খল বৃত্তিটাকে কিছুতেই দমন ক'রতে পারলুম না। তাতে কিন্তু আমার দোষ দিতে পারবে না, কেন না তোমার মনে তো চির দিনই গভীর বিশ্বাস, যে, আমার মতন এত বড় স্বার্থপর হিংসুটে দুনিয়ায় আর দু'টী নেই। . . .

আমার কথা তোমার কাছে কোন দিনই ভাল লাগে নি, (কেন, তা পরে ব'লছি), আজও লাগবে না। তবু লক্ষ্মী, এই

মনে ক'রে চিঠিটা একটু প'ড়ে দেখো, যে এটা একটা হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া পথিকের অন্ত-পারের পথহারা-পথে চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার বিদায়-কান্না। আজ আমি বড় নিষ্ঠুর, বড় নির্ম্মম। আমার কথাগুলো তোমার বে-দাগ বুকে না-জানি কত দাগই কেটে দেবে! কিন্তু বড় বেদনায় প্রিয়, বড় বেদনায় আজ আমায় এত বড় বিদ্রোহী, এত বড় স্বেচ্ছাচারী উন্মাদ ক'রে তুলেছে! তাই আজও এসেছি কাঁদাতে। তুমিও বল, আমি আজ জল্লাদ, আমি আজ হত্যাকারী কশাই! শুনে একটু সুখী হই।

আমার মন বড় বিক্ষিপ্ত। তাই কোনো কথাই হয়তো গুছিয়ে ব'লতে পার্‌ব না। যার সারা জীবনটাই ব'য়ে গেল বিশৃঙ্খল আর অনিয়মের পূজা ক'রে, তার লেখায় শৃঙ্খলা বা বাঁধন খুঁজ্‌তে যেয়ো না! হয়তো যেটা আরম্ভ ক'রব সেইটেই শেষের, আর যেটায় শেষ ক'রব সেইটেই আরম্ভের কথা। আসল কথা, অন্যে বুঝুক চাই নাই বুঝুক, তুমি বুঝ্‌লেই হ'ল। আমার বুকের এই অসম্পূর্ণ না-কওয়া কথা আর ব্যথা তোমার বুকের কথা আর ব্যথা দিয়ে পূর্ণ ক'রে ভ'রে নিয়ো।—এখন শোনো।

প্রথমেই আমার মনে প'ড়ছে আজ বোধ হয় তোমার (অ মনেই প'ড়বে না), তুমি এক দিন যেন সাঁঝে আমায় জিজ্ঞেস ক'রেছিলে—কি ক'রলে তুমি ভাল হবে?

তোমারই মুখে আমার রোগ-শিয়রে এই নিষ্ঠুর প্রশ্ন শুনে অধীর অভিমানের গুরু বেদনায় আমার বুকের তলা যেন তোলপাড় ক'রে উঠ্‌ল!

হায় আমার অসহায় অভিমান। হায় আমার লাঞ্ছিত অনাদৃত ভালবাসা! আমি তোমার সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি নি। দেওয়া উচিতও হ'ত না! তখন আমার হিয়ার বেদনা-মন্দিরে যেন লক্ষ তরুণ সন্ন্যাসীর ব্যর্থ জীবনের আর্ত্ত হাহাকার আর বঞ্চিত যৌবনের সঞ্চিত ব্যথা-নিবেদনের গভীর আরতি হ'চ্ছিল। যার জন্যে আমার এত ব্যথা, সেই এসে কিনা জিজ্ঞেস করে,—তোমার বেদনা ভাল হবে কিসে? . . .

মনে হ'ল, তুমি আমায় উপহাস আর অপমান ক'রতেই অমন ক'রে ব্যথা দিয়ে কথা ক'য়ে গেলে! তাই আমার বুকের ব্যথাটা তখন দশ গুণ হ'য়ে দেখা দিল। আমি পাশের বালিশটা বুকে জড়িয়ে নিয়ে উপুড় হ'য়ে শুয়ে প'ড়লুম। আমার সব চেয়ে বেশী লজ্জা হ'তে লাগল, পাছে তুমি আমার অবাধ্য চোখের জল দেখে ফেল! পাছে তুমি জেনে ফেল যে, আমার বুকের ব্যথাটা আবার বেড়ে উঠেছে! যে আমার প্রাণের দরদ বোঝে না, সেই বে-দরদীর কাছে চোখের জল ফেলা আর ব্যথায় এমন অভিভূত হ'য়ে পড়ার মত দুর্নিবার লজ্জা আর অপমানের কথা আর কি থাকতে পারে? কথাও ক'ইতে পারছিলুম না, ভয় হ'চ্ছিল এখনই আর্দ্র গলার স্বরে তুমি আমার কান্না ধ'রে ফেলবে।

যাক, আমায় খোদা রক্ষা ক'রলেন সে বিপদ থেকে। তুমি অনেক ক্ষণ দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবতে লাগলে। তার পর আস্তে আস্তে চ'লে গেলে। তুমি বোধ হয় আজ প'ড়ে হাসবে, যদি বলি যে, আমার তখন মনে হ'ল যেন তুমি যাবার বেলায় ছোট্ট একটী শ্বাস ফেলে গিয়েছিলে! হায় রে অন্ধ বধির

ভিখারী মন আমার! যদি তাই হ'ত, তবে অন্ততঃ কেন আমি অমন ক'রে শুয়ে প'ড়লুম, তা একটু মুখের কথায় শুধাতেও তো পার্‌তে!

তুমি চ'লে যাবার পরই ব্যথায় অভিমানে আমার বুক যেন একেবারে ভেঙে প'ড়ল! নিষ্ফল আক্রোশ আর ব্যর্থ বেদনার জ্বালায় আমি হুঁক্‌রে হুঁক্‌রে কাঁদ্‌তে লাগলুম! তখন সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে। তার পর ডাক্তার এল, আত্মীয়-স্বজন এল, বন্ধু-বান্ধব এল। সবাই ব'ললে,—হৃদ্‌-যন্ত্রের ক্রিয়া বড় অস্বাভাবিক। গতিক . . . . ডাক্তার ব'ললে,—রোগী হঠাৎ কোনো—ইয়ে—কোনো—বিশেষ কারণে এমন অভিভূত হ'য়ে প'ড়েছে। এ কিন্তু বড্ডো খারাব। এতে এমনও হ'তে পারে যে . . . .

বাকীটুকু ডাক্তার আম্‌তা আম্‌তা ক'রে না ব'ললেও আমি সেটার পূরণ ক'রে দিলুম,—"একেবারে নির্ব্বাণ দীপ গৃহ অন্ধকার!" না ডাক্তার বাবু?—ব'লেই হাস্‌তে গিয়ে কিন্তু এত কান্না পেল আমার, যে, তা অনেকেরই চোখ এড়ালো না। সত্যিই তখন আমার কণ্ঠ বড় কেঁপে উঠেছিল, অধর কুঞ্চিত হ'য়ে উঠেছিল, চোখের পাতা সিক্ত হ'য়ে উঠেছিল! আমি আবার উপুড় হ'য়ে শুয়ে প'ড়লুম। অনেক সাধ্য সাধনা ক'রেও কেউ আর আমায় তুলতে পারলে না। আমার গোঁয়ারতুমীর অনেক ক্ষণ ধ'রে নিন্দে ক'রে বন্ধু-বান্ধবরা বিদায় নিলে। আমিও মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দিলুম।

হায়, এই নিষ্ঠুর লোকগুলো কি আমায় একটু নিরিবিলি কেঁদে শান্তি পেতেও দেবে না? . . . তখনও তোমরা সবাই কেউ আমার পাশে, কেউ বা আমার শিয়রে ব'সে ছিলে। হঠাৎ মনে হ'ল, তুমি এসে আমার হাত ধ'রেছ! এক নিমিষে আমার সকল ব্যাথা যেন জুড়িয়ে জল হ'য়ে গেল! এবারেও কান্না এল, কিন্তু সে যেন কেমন এক সুখের কান্না। তবে এ কান্নাতেও যে অভিমান ছিল না, তা নয়। তবু তোমার ঐ ছোঁওয়াটুকুর আনন্দেই আমি আমার সকল জ্বালা সকল ব্যথা-বেদনা মান-অপমানের কথা ভুলে গেলুম। মনে হ'ল, তুমি আমার—তুমি আমার—একা আমার! হায় রে শাশ্বত ভিখারী! চির-তৃষাতুর দীন অন্তর আমার! কত অল্প নিয়েই না তুই তোর আপন বুকের পূর্ণতা দিয়ে তাকে ভরিয়ে তুলতে চাস, তবু তোর আপন জনকে আর পেলি নে!

খানিক পরেই আমি আবার সকলের সঙ্গে দিব্যি প্রাণ খুলে হাসি গল্প জুড়ে দিলুম দেখে সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলে। কেউ বুঝলে না, হয়তো তুমিও বোঝ নি, কেমন ক'রে অত অধীর বেদনা আমার এক পলকে শান্ত স্থির হ'য়ে গেল! সে সুখ সে ব্যথা শুধু আমি জানলুম আর আমার অন্তর্যামী জানলেন। হাঁ, সত্যি ব'লব কি? আরও মনে হ'য়েছিল, সে ব্যথা যেন তুমিও একটু বুঝতে পেরেছিলে? দেখেছ? কি ভিখিরী মন আমার! তুমি না জানি আমায় কতই ছোট মনে ক'রছ! আহা, একবার যদি মিথ্যা ক'রেও ব'লতে লক্ষ্মী, যে, আমার ব্যথার কারণ অন্ততঃ তুমি মনে মনে জেনেছ, তা হ'লে আমি আজ অমন ক'রে হয়তো ফুটতে না

ফুট্‌তেই ঝ'রে প'ড়তুম না! আমার জীবন এমন ছন্নছাড়া 'দেবদাস'-এর জীবন হ'য়ে প'ড়ত না! যাঃ, খেই হারিয়ে ব'সেছি আমার কথার!

হাঁ,—সে দিন তোমার ঐ একটু উষ্ণ ছোঁওয়ার আনন্দেই বিভোর হ'য়ে রইলুম। তার পরের দিন মনে হ'তে লাগ্‌ল, তোমায় আড়ালে ডেকে বলি, কেন আমার এ বুক-ভরা ব্যথার সৃষ্টি। সারা দিন তোমার পানে উৎসুক হ'য়ে চেয়ে রইলুম, যদি আবার এসে জিজ্ঞেস কর তেম্‌নি ক'রে—"কি ক'রলে তুমি ভাল হবে?"

হায় রে দুর্ভাগার আশা! তুমি ভুলেও আর সে কথাটী আর একবার শুধালে না এসে। সারা দিন আকুল উৎকণ্ঠা নিয়ে বেলা-শেষের সাথে সাথে আমারো প্রাণ যেন কেমন নেতিয়ে প'ড়তে লাগ্‌ল! আমার কাঙাল আত্মার এক নির্লজ্জ বেদনা ভুলবার জন্যে আমার সব চেয়ে প্রিয় গানটা বড় দুঃখে বড় প্রাণ ভ'রেই গাইতে লাগ্‌লুম,—

"তুমি জান ওগো অন্তর্যামী
পথে পথেই মন ফিরালেম আমি।
ভাবনা আমার বাঁধলনাকো বাসা,
কেবল তাদের স্রোতের পরেই ভাসা,
তবু আমার মনে আছে আশা
তোমার পায়ে ঠেক্‌বে তারা স্বামী।

টেনেছিল কতই কান্না হাসি.
বারে বারেই ছিন্ন হ'ল ফাঁসি।
সুধায় সবাই হতভাগ্য ব'লে
"মাথা কোথায় রাখ্‌বি সন্ধ্যা হ'লে ?
জানি জানি নাম্‌বে তোমার কোলে
আপনি যেথায় প'ড়বে মাথা নামি ॥"

আমার কণ্ঠ আমার আঁখি আমারই ব্যথায় ভিজে ভারী হ'য়ে উঠ্‌ল ! আমার গানের সময় আমি আর বাহিরকে ফাঁকি দিতে পারি নে। সে সুর তখন আমার স্বরে কেঁপে কেঁপে ক্রন্দন করে, সে সুর সে কান্না আমার কণ্ঠের নয়, আমার প্রাণের ক্রন্দসীর। গান গেয়ে মনে হ'ল, যেন এই বিশ্বে আমার মতন ছন্ন-ছাড়ারও অন্ততঃ এক জন বন্ধু আছেন, যিনি আমার প্রাণের জ্বালা, মর্ম্ম-ব্যথা বোঝেন, আমার গান শুনে যাঁর চোখের পাতা ভিজে ওঠে। তিনি আমার অন্তর্যামী। অম্‌নি এ কথাটীও মনে হ'য়েছিল, যে, যদি সত্যিই আমার কেউ প্রিয়া থাক্‌ত, তা হ'লে সে আমার ঐ "শুধোয় সবাই হতভাগ্য ব'লে, মাথা কোথায় রাখবি সন্ধ্যে হ'লে !"—ঐটুকু শুন্‌বার পরই আর দূরে থাকতে পার্‌ত না, তার কোলে আমার মাথাটী থুয়ে সজল কণ্ঠে ব'লত,—"ওগো, আমার কোলে প্রিয়, আমার কোলে !" তার তরুণ কণ্ঠে করুণ মিনতি ব্যথায় অভিমানে কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ত,—"ছি লক্ষ্মী ! এ গান গাইতে পাবে না তুমি !"

কি বিশ্রী লোভী আমি, দেখেছ ? তুমি হয়তো এতক্ষণ হেসে লুটিয়ে প'ড়েছ, আমার এই ছেলে-মানুষী আর কাতরতা দেখে !

তুমি হয়তো ভাবছ, কি ক'রে এত বড় দুর্জ্জয় অভিমানী, দুরন্ত বাঁধন-হারা এমন ক'রে নেতিয়ে পায়ে লুটিয়ে প'ড়তে পারে, কেমন ক'রে এক বিশ্বজয়ীর এত অল্পে এমন আশ্চর্য্য এত বড় পরাজয় হ'তে পারে! তা ভাব, কোন দুঃখ নেই। আমিও নিজেই তাই ভাবছি। কিন্তু ভয় হয় প্রিয়, কখন্ তোমার এত গরব না-জানি এক নিমেষে টুটে গিয়ে 'সলিল ব'য়ে যাবে নয়ানে!' সেই দিন হয়তো আমার এ ভালবাসার ব্যথা বুঝবে। আমার এই পরাজয়ের মানেও বুঝবে সে দিন।

যাক, যা ব'লছিলাম তাই বলি।—গান গেয়ে কেন আমার মনে হ'ল, আমার অন্তর্যামী বুঝি আমার আঁখির আগে এসে নীরবে জল-ছল-ছল চোখে দাঁড়িয়ে। চোখের জল মুছে সাম্‌নে চাইতেই,—ও হরি! কে তুমি দাঁড়িয়ে অমন করুণ চোখে আমার পানে চেয়ে? আহা, চটুল চোখের কালো তারা দু'টী তাদের দুষ্টুমী চঞ্চলতা ভুলে গিয়ে ব্যথায় যেন নিথর হ'য়ে গেছে! সে পাগল-চোখের কাজল আঁখি-পাতা যেন জল-ভারাতুর। ওগো আমার অন্তর্যামী! তুমি কি সত্যসত্যই এই সাঁঝের তিমিরে আমার আঁখির আগে এসে দাঁড়ালে? হে আমার দেবতা! তবে কি আমার আজিকার এ সন্ধ্যা-আরতি বিফলে যায় নি? আমি আমার সব কিছু ভুলে কেমন যেন আত্মবিস্মৃতের মত ব'লে উঠ্‌লুম,—তুমি আমার চেয়ে কাউকে বেশী ভালবাসতে পাবে না! কেমন?

কোনো কথা না ব'লে তুমি আমার কোলের উপরকার বালিশটীতে এসে মুখ লুকালে। কেন? লজ্জায়? না সুখে? না ব্যথায়? জানি না, কেন! তাই তো আজ

আমার এত দুঃখ, আর এত প্রাণ-পোড়ানী! তোমার প্রাণের কথা তুমি কোনো দিনই একটী কথাতেও জানাও নি, তাই তো আজ আমার বুক জুড়ে এত না-জানার ব্যথা! অনেক সাধ্য-সাধনায় তুমি মুখ তুলে চাইলে, কিন্তু ব'ললে না, কেন অমন ক'রে মুখ লুকালে! সে দিন একটীবার যদি মিথ্যা ক'রেও ব'লতে,—হে আমার চির-জনমের প্রিয়! যে, ... ! না, না, যাক সে কথা!

এইখানে একটা মজার খবর দিই তোমাকে। এই হাজত-ঘরে ব'সেও আমার এমন অসময়ে মনে হ'চ্চে যেন আমি এক জন কবি! রোসো, এখনই হেসে লুটিয়ে প'ড়ো না! তোমার চেয়ে আমি ভাল ক'রেই জানি, যে, আমার কবি না হওয়ার জন্যে যা-কিছু চেষ্টা-চরিত্তির করার প্রয়োজন, তার কোনটাই বাদ দেন নি ভগবান। তাই আমার বাহির ভিতর সব কিছুই যেন খোট্টাই মুলুকের চোট্টাই ভেইয়্যার মতই কাট-খোট্টা। তবু যদি আমি কবি হতুম, তা হ'লে আমার এই ভাবটাকে কি সুন্দর ক'রেই না ব'লতুম,—

শুধু অনাদর, শুধু অবহেলা, শুধু অপমান!
ভালবাসা?—সে শুধু কথার কথা যে!
অপমান কেনা শুধু! প্রাণ দিলে পায়ে হ'লে বাবে তোর প্রাণ!
শুধু অনাদর, শুধু অবহেলা, শুধু অপমান!

যাক, যা হইনি, কপাল ঠুকলেও আর তা হ'চ্ছি নে। এখন যা আছি, তাই নিয়েই আলোচনা করা যাক।

দাঁড়াও,—অভিমান অভিমান ক'রে চেঁচিয়ে হয়তো ও-কথাটার অপমানই ক'রছি আমি। নয় কি? আমার মতন

হয়তো তুমিও ভাবছ, কার ওপর এ অভিমান আমার? কে আমায় এ অধিকার দিয়েছে এত অভিমান দেখাবার? এক বিন্দু ভালবাসা পেলাম না, অথচ এক সিন্ধু অভিমান নিয়ে ব'সে আছি। তবু শুনে আশ্চর্য্য হবে তুমি, যে, সত্যি-সত্যিই আমার বড্ডো অভিমান হয়। যার ওপর অভিমান করি, সে আমার এ অভিমান দেখে হাস্‌বে, না ছু' পায়ে মাড়িয়ে চ'লে যাবে, সে দিকে ভ্রূক্ষেপও করি না। চেয়েও দেখি না, আমার এত ভালবাসার সম্মান সে রাখবে কি না, শুধু নিজের ভালবাসার গরবে আর অন্ধতায় মনে করি, সেও আমায় ভালবাসে! তাই তো আজ আমার এত লাঞ্ছনা ঘরে বাইরে!

অনেক পথিক-বালা এ পথিকের পথের ব্যথা মুছিয়ে দিতে চেয়েছিল, হয়তো ভালও বেসেছিল (শুনে হেসো না), আমি কিন্তু ফিরেও চাই নি তাদের পানে। ওর মধ্যে আমার কতকটা গরবও ছিল। মনে হ'ত, এ বালিকা তো আমার সাথে পা মিলিয়ে চ'লতে পার্‌বে না, অনর্থক কেন তার জীবনটাকে ব্যর্থ ক'রে দেব? যে-সে এসে আমার মতন বাঁধন-হারা বিদ্রোহী মনটাকে এত অল্প সাধনায় জয় ক'রে নেবে, এও যেন সইতে পার্‌তুম না। তাই কোন হতভাগীর মনে আমার ছাপ লেগেছে বুঝতে পার্‌লেই আমি অম্‌নি দূরে— অনেক দূরে স'রে যেতুম; আর দেখ্‌তুম, তার এ আকর্ষণের জোর কত—সে সত্যি আমায় ভালবাসে, না একটু করুণা করে, না ওটা মোহ? ঐ দূরে স'রে যাবার আর একটা কারণও ছিল, যে, আমাদের কাউকে যেন কোন দিন অনুতাপ ক'রতে না হয় শেষে কোন ভুলের জন্যে।

আমার এক জায়গায় বড় দুর্ব্বলতা আছে। স্নেহের হাতে আমার মত এমন ক'রে কেউ বুঝি আত্মসমর্পণ ক'রতে পারে না। তাই কেউ স্নেহ ক'রছে বুঝলেই অম্‌নি বাঁধা প'ড়বার ভয়ে আমি পালিয়ে যেতুম। ঐ দূরে গিয়ে কিন্তু অনেকেরই ভুল ধরা প'ড়ে গেছে। অনেকেই নাকি আমায় ভালবেসেছিল, কিন্তু তাদের সকলেরই মনের মিথ্যেটা আমি দেখ্‌তে পেয়েছিলুম ঐ দূরে স'রে গিয়েই। তাদের কেউ আমায় তার জীবন ভ'রে পেতে চায় নি। আমি পথিক, তাই পথের মাঝে আমায় একটু ক্ষণের জন্যে পেতে চেয়েছিল মাত্র। তাই কেউ আমায় কোন দিনই তার হাতের নাগালের মধ্যেও পেলে না। অনেকে বলে, হয়তো এটাও আমার অভিমান। জানি না। কিন্তু দু'-এক জায়গায় একটু আত্মবিস্মৃত হ'য়ে যেই নিকটে আস্‌তে চেয়েছি, অম্‌নি সে আমার দেবতার—আমার ভালবাসার বুকে জোর পদাঘাত ক'রেছে! তবু কি তুমি ব'লবে, ও আমার অহেতুক অভিমান?

এইখানে একটা কথা মনে রেখো কিন্তু, যে, এই যে যারা আমায় পেতে চেয়েছিল, তাদের সকলেই আগে আমায় ভালবেসেছিল, আমি কখনো তাদের ভালবাসি নি। অন্ত পেয়েও আমার মন চিরদিন ব'লে এসেছে,—এ নহে, এ নহে!

হায় আমার অতৃপ্ত হিয়া! কা'কে চা'স তুই? কে সে তোর প্রিয়তমা? কে সে গরবিনী, কোথায় কোন্ আঙিনায় তোর তরে মালা-হাতে দাঁড়িয়ে রে? . . . আমার মনের যে মানসী প্রিয়া, তাকে না পেয়েই তো কাউকে ভালবাস্‌তে পারলুম না এ-জীবনে। কতগুলি কচি বুকই না

দ'লে গেলুম আমার এই জীবনের আরম্ভ হ'তে না হ'তেই, তা, ভেবে আজ আর আমার কষ্টের অন্ত নেই। তবে আমার এই-টুকু সান্ত্বনা, যে, আমি কারুর ভালবাসার অপমান করি নি। কাউকে ভালবেসেছি ব'লে প্রলোভন দেখিয়ে শেষে পথে ফেলে চ'লে যাই নি। উল্টো তাদের কাছে দু' হাত জুড়ে ক্ষমাই চেয়েছি, অম্‌নি ক'রে সুদূর থেকেই। আমায় ভাল না বাস্‌তে অনুরোধ ক'রে তার পথ থেকে চিরদিনের মত স'রে গিয়েছি। পাছে কোন দিন কোন কাজে তার বাধা পড়ে, সেই ভয়ে আর কোন দিন তার পথের পাশ দিয়েও চলি নি। অনেকে আমায় অভিশাপও দিয়েছে আমার এই নির্ম্মমতার জন্যে, অনেকে আবার অহঙ্কারী দর্পী ব'লে গালও দিয়েছে।

এমনি ক'রে বিজয়ী বীরের মত আপন মনে পথে-বিপথে আমার রথ চালিয়ে বেড়াচ্ছিলুম। এমন সময় এক দিন সকালে তোমায় আমায় দেখা। হঠাৎ আমার রথ থেমে গেল। আমার মন কি এক বিপুল সুখে আনন্দ-ধ্বনি ক'রে উঠ্‌ল,—পেয়েছি, পেয়েছি! আমার মনের পথিক-বন্ধু হঠাৎ ম্লান মুখে আমার সাম্‌নে এসে ব'ললে, —বন্ধু বিদায়! আর তুমি আমার নও; এখন তুমি তোমার মানসীর! তোমার পথের শেষ হ'য়েছে! দেখ্‌লুম, সে পথের শেষে দিগন্তের আঁধারে মিলিয়ে গেল।

এত দিন আমায় শত সাধ্য-সাধনা ক'রেও পথিক-বালারা আমার রথ থামাতে পারে নি, কত জন রথের চাকার সাম্‌নে বুক পেতে শুয়ে প'ড়েছে, আমি হাস্‌তে হাস্‌তে তাদের বুকের ওপর দিয়ে রথ চালিয়ে নিয়ে গিয়েছি,—কিন্তু হায়! আজ আমার এ কি হ'ল? রথ যে আর চলে না! তুমি শুধু

আমার পানে চোখ তুলে চাইলে মাত্র, একটু সাধলেও না যে, পথিক! আমার দ্বারে একটু থাম।

তবু আমার দুঃখ হ'ল না, মান-অপমান জ্ঞান রইল না, আমি মালা-হাতে রথ থেকে নেমে প'ড়লুম। তোমার গলায় আমার জন্ম-জন্মের সাধের গাঁথা মালা পরিয়ে দিলুম। তুমি নীরবে মাথা নত ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে। তোমার ঐ মৌন বুকের ভাষা বুঝতে পারলুম না! প্রাণ যেন কেমন ক'রে উঠ্‌ল! তুমি সুখী হ'লে, না, ব্যথা পেলে, কিছুই বোঝা গেল না। অমনি চির অভিমানী আমার বুকে বড় বাজ্‌ল। ভগবান কেন অন্যের মনটা দেখবার শক্তি দেন নি মানুষকে? কিন্তু তোমার প্রতি অভিমান আমার যতই হোক, তোমাকে নালিশ ক'রবার কিছুই ছিল না আমার (আজও নেই)। আমি যে তোমার মনটা না জেনেই তোমায় ভালবেসেছি। চিরদিন জয় ক'রে ফিরে তোমার গলায় যে হা'র-মানা হার পরিয়েছি—তুমি যে আমার মানসী প্রিয়া। আমার মনে মনে জন্মজন্মান্তর ধ'রে যে ছবি আঁকা ছিল, যাকে খুঁজ্‌তে এমন ক'রে আমার এমন চিরন্তন-পথিক বেশ, সে মানসীকে দেখেই চিনে নিয়েছি। তাই আমি একটু ক্ষণের জন্যেও ভেবে দেখি নি, তুমি এ পরাজিত বিদ্রোহীর নৈবেদ্য-মালা হেসে গ্রহণ ক'রবে, না, পায়ে ঠেলে চ'লে যাবে। তুমি যদি আমায় ভাল না বাসতে পার, তার জন্যে তো তোমায় দোষ দিতে পারি নে। আমি জানি, খুব জানি প্রিয়, যে, কোন মানুষেরই মন তার অধীন নয়। সে যাকে ভালবাস্‌তে চায়, যাকে ভালবাসা কর্ত্তব্য মনে করে, মন তাকে কিছুতেই ভালবাস্‌বে না। মন তার মনের মানুষের

জন্যে নিরন্তর কেঁদে ম'রছে, সে অন্যকে ভালবাসতে পারে না। কত জন্ম ধ'রে তোমায় খুঁজে বেড়িয়েছি এমনই ক'রে, তুমি কিন্তু ধরা দাও নি ; এবারেও ধরা দিলে না ! কখন্ কোন্ জন্মে কোন্ নাম-হারা গাঁয়ের পাশে তোমায় আমায় ঘর বাঁধ্‌ব, কখন্ তুমি আমায় ভালবাস্‌বে জানি নে। তবু আমি তোমায় ভালবাসি, তাই আমার এত বিপুল অভিমান তোমার ওপর।

ধর, আমার এ অভিমান যদি মিথ্যে হয়, যদি সত্যিই তুমি আমায় ভালবাস, তা হ'লে হয়তো মনে ক'রবে, যে, আমি কেন তোমায় ভুল বুঝে এমন ক'রে কষ্ট পাচ্ছি। কেন তোমাকে এমন ক'রে ব্যথা দিচ্ছি। সেই কথাটা জানবার জন্যেই কাল সারা রাত্তির ধ'রে তোমার দয়ার দান চিঠি ক'টা নিয়ে হাজার বার ক'রে প'ড়েছি, কিন্তু হায়, তাতেও এমন কিছু পেলুম না, যাতে ক'রে আমার এ নির্ম্মম ধারণা, কঠোর বিশ্বাস দূর হ'য়ে যেতে পারে। আমার দুঃখে আমার বেদনায় করুণা-বিগলিত হৃদয়ে অনেক সান্ত্বনা দিয়েছ, অনেক কিছু লিখেছ, অনেক জায়গায় প'ড়তে প'ড়তে চোখের জলও বাধা মানে না, কিন্তু "তোমায় আমি ভালবাসি" এই কথাটী কোথাও লেখ নি—ভুলেও না। ঐ কথাটী ঢাক্‌বার জন্যে যে সলজ্জ কুণ্ঠা বা আকুলতা, তাও নেই কোন চিঠির কোন খানটীতেই। হায় রে অন্ধ বিশ্বাস আমার! তবু এত দিন কত অধিকার নিয়ে কত অভিমান ক'রেই না তোমায় চিঠি দিয়ে এসেছি। সেই লজ্জায় সেই অপমানে আজ আমার বুকের বেদনা শতগুণে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌ছে, তবু কিন্তু আর তোমায় ছেড়ে দূরে চ'লে যেতে পারছি নে। এবার যে আমি আগে ভালবেসেছি। যে

আগে ভালবাসে, প্রায়ই তার এই দুর্দ্দশা এই লাঞ্ছনা ভোগ ক'রতে হয়। তাই বড় দুঃখে আজ অবিশ্বাসী নাস্তিকের মত এই ব'লে ম'রতে যাচ্ছি, যে, পৃথিবীতে ভালবাসা ব'লে কোন জিনিস নেই। ভালবেসে ভালবাসা পাওয়া যায় না এই অবহেলার মাটীর ধরায়। মানুষ যে কত বড় ঘা খেয়ে অবিশ্বাসী নাস্তিক হয়, তা যে নাস্তিক হয়, সেই বোঝে। জানি, ভালবেসে আত্মদানেই তৃপ্তি। বিশ্বাসও করি, যাকে সত্যিকার ভালবাসা যায়, সে অপমান আঘাত ক'রলে হাজার ব্যথা দিলে তাকে ভোলা যায় না। প্রিয়ের দেওয়া সেই ব্যথাও যেন সুখের মতই প্রিয় হ'য়ে ওঠে। কিন্তু তাই ব'লে এত প্রাণ-ঢালা ভালবাসার বিনিময়ে একটু ভালবাসা পাবার জন্যে প্রাণটা হা-হা ক'রে কেঁদে ওঠে না, এ যে বলে, সে সত্যি কথা বলে না।

পুরুষ জন্ম-জন্ম সাধনা ক'রেও নারীর মন পাচ্ছে না। নারীর অন্তরের রহস্য বড় জটিল, বড় গোপন। নারী সব দিতে পারে, কিন্তু তার মনের গোপন মঞ্জুষার কুঞ্জিকাটী যেন কিছুতেই দিতে চায় না। শুনেছি, কাউকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসলে তবে তার হাতে ঐ চাবিকাঠিটী নাকি সমর্পণ করে। তোমার ওপর আজ আমার এত অভিমান কেন, জান ? তুমি আমার সকল আদর সকল সোহাগ আমার দুরন্ত ভালবাসার সকল বাড়াবাড়ি নীরবে স'য়ে গেছ। কখনো এতটুকু প্রতিবাদ কর নি। তোমার মুখ দেখে কোন দিন বুঝ্‌তে পারি নি, তুমি আমার সে আদর-সোহাগে ব্যথা পেয়েছ, না, সুখী হ'য়েছ। তোমার মুখে কোন দিন এক রেখা হাসিও ফুটে উঠতে দেখি নি সে সময়। তাই

আজ এই কথাটা ভাব্‌তে বুক আমার ভেঙে প'ড়ছে, যে, হয়তো তুমি দায়ে প'ড়েই আমার অত বাড়াবাড়ি নীরবে স'য়েছ, হয়তো ওতে কত ব্যথাই পেয়েছ মনে মনে। কোন চিঠিতে ও-কথাটার ভুলেও উল্লেখ কর নি। তাই মনে হয়, ওটাকে কোন রকমে চাপা দেওয়াই তোমার ইচ্ছা। আচ্ছা, তাই হোক্! এইবার সকল ভুল সকল যাতনা চিরতরেই চাপা প'ড়বে, ফির্‌লেও আর সে-কথা কখনো তুল্‌ব না, না ফির্‌লে তো নয়ই। তাতে প্রাণ যত বেশীই ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে যাক্ না কেন। যদি ফিরি, তবে আর একবার আত্মবিদ্রোহী হবার শেষ চেষ্টা ক'রব। কিন্তু হায়! কার কাছে এ কথা ব'লছি! কোন্ পাষাণ মৌন নির্ব্বাক দেবতা আমার এ তিক্ত ক্রন্দন শুন্‌ছে? যা ব'লছিলাম, তাই বলি।

আমি কেন সুখী হ'তে পার্‌ছি নে, জান? সাধারণ লোকের মতন সহজ ভালবাসায় তুষ্ট হ'তে পার্‌ছি নে ব'লে! আমারই চারি পাশে আর সকলে কেমন খাচ্ছে-দাচ্ছে, স্ত্রীর সঙ্গে ঝগ্‌ড়া ক'রছে—আবার তখনি মিল হ'য়ে যাচ্ছে,—এমনি ক'রে তাদের সুখে-দুঃখে বেশ চ'লে যাচ্ছে। কিন্তু এই সাধারণের পথ ধ'রে চ'লতে পারি নে ব'লেই ওদের এক জন হ'য়ে সুখী হওয়া তো দূরের কথা, এম্‌নি অসুখীও হ'তে পার্‌লুম না। ওরা বিয়ে করে, ছেলে-পিলে হয়, বড় হ'লে বিয়ে দেয়, জামাই বৌ ঘরে আসে,—বাস্, আর কি চাই? ওরই মধ্যে হাসে, কাঁদে, সব করে। ওরা ওতেই সুখী। ওরা যা পেয়েছে, তাতেই তুষ্ট। কিন্তু আমার মনে হয়, বেচারাদের শতকরা নব্বই জনই যেন জানে না আর জান্‌তে চায় না, যে, যে-মানুষটাকে নিয়ে এত

দিন ঘরকন্না ক'রছে, সেই মানুষটীর মনটাই তার নয়। দুই জনেই দুই জনের মন কোন দিন বোঝে নি, বুঝবার দরকারও হয় নি। এত কাছাকাছি থেকেও তাই মনের দেশে দুই জন দুই জনের সম্পূর্ণ অপরিচিত। এই ফাঁকি আমার চোখে যে দিন ধরা প'ড়েছে, সেই দিন থেকে আমি আর কাউকে সাথী ক'রে ঘর বাঁধ্‌তে সাহস পাচ্ছি নে। সদা ভয় হয় আর ব্যথাও বাজে এই কথাটী ভাব্‌তে, যে, আমারই বুকে মাথা রেখে আমারই জীবন-সঙ্গিনী অন্যের কথা ভাব্‌বে, তার ব্যর্থ জীবনের জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলবে, আর আমি তারই কাছে আমার ভালবাসার অভিনয় ক'রে যাব, সেও দায়ে প'ড়ে দিব্যি স'য়ে যাবে। উঃ! এ-কথা ভাব্‌তেও আমার গা শিউরে ওঠে! আমি যাকে নিয়ে বাসা বাঁধ্‌ব, আগে দেখে নেব তার মনের মানুষটী আমার মনের মানুষটীকে চিনেছে কি না। তা যত জন্ম না হবে, তত জন্ম আমি হয় মায়ের লক্ষ্মী ছেলেটী হ'য়ে মায়ের কোলেই থাক্‌ব, নতুবা লোটা-কম্‌লী নিয়ে এম্‌নি বোম্‌-বোম্ ক'রেই বেড়িয়ে বেড়াব।

আমি মানুষ দেখেই তার মনের কথা ধ'রে দিতে পারি ব'লে বড্ডো গর্ব্ব ক'রে এসেছি এত দিন, আর অনেক জায়গাতেই চিনেওছি ঠিক। কিন্তু তোমার কাছে যে এমন ক'রে আমার সকল অহঙ্কার চোখের জলে ডুবে যাবে, তা কে জানত! সত্যই,

> 'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে, কখন কে ধরা পড়ে কে জানে,
> সকল গরব হায়, নিমেষে টুটে যায়, সলিল ব'য়ে যায় নয়ানে।"

তা না হ'লে এত বড় দুর্দ্দান্ত দুর্ব্বার আমাকেও তুমি আজ শিশুর মতন ক'রে কাঁদাচ্ছ! তুমি আর-সকলের কাছে এত

সরল, আর আমার কাছেই কেন এত তুর্ব্বোধ হ'য়ে পড়েছ, ব'লতে পার লক্ষ্মীমণি ?—হাঁ, একটী কথা নিবেদন ক'রে রাখি এর মধ্যে,—যখন জীবনে বড্ডো ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়বে তোমার ভালবাসার অবমাননা দেখে, যখন দেখবে তোমার বুক-ভরা অভিমান পদাহত হ'য়ে ধূলোয় প'ড়ে লুটাচ্ছে, যখন নিরাশায় বুক ভেঙে যেতে চাইবে (খোদা না করুন), সে দিন এই ভেবে সান্ত্বনা পেয়ো প্রিয় আমার, যে, এই তুঃখের সংসারেও অন্ততঃ এক জন ছিল, যে তোমায় বড় প্রাণ ভ'রে ভালবেসেছিল। বিনিময়ে তার এক কণাও ভালবাসা সে পায় নি, তবু সে এতটুকু ব্যথা রেখে যায় নি তোমার জন্যে, এমন কি কোন দিন তোমার কাছে তা নিয়ে অনুযোগও করে নি। সে তোমায় পেলে মাথার মণি ক'রে রাখ্‌ত। তোমাকে রাজ-রাজেন্দ্রাণী ক'রবার সকল ক্ষমতা সকল সাধ তার ছিল। তোমার এত ভালবাসা এত অভিমানের অধিকারী হ'লে সে এমন ক'রে তার বিপুল আশা-আকাঙ্ক্ষা-ভরা উদ্দাম তরুণ জীবনকে এত অল্প দিনে ব্যর্থ ক'রে এমন ক'রে বিদায় নিত না। সে অনেক—অনেক বড় কিছু বিশ্বের বিস্ময় হ'তে পারত। বড় ব্যথায় তার সারা জীবনটা বিদ্রোহ আর স্বেচ্ছাচারিতা ক'রেই কেটে গেল! আরও মনে ক'রো যে পর-পারে গিয়েও সে শান্ত হ'তে পারে নি, চিরদিনের মত এবারেও সে সেখানে তোমারই তরে মালা হাতে ক'রে তার অশান্ত জীবন ব'য়ে বেড়াচ্ছে পথে পথে ঘুরে। তোমায় বুকে ক'রে তুলে নেবার জন্যে সে সকল সময় তোমার পানে তার সকল প্রাণ-মন নিয়োজিত ক'রে রেখেছে। সে যে তোমায় সত্যিই ভালবাসে, তাই প্রমাণ ক'রতে সে তার নিজের

গর্দ্দানে নিজে খড়্গ হেনে ম'রেছে। আরো মনে ক'রো সেই দিন, যাকে তুমি এক দিন মনে মনে তোমার সুখের পথের কাঁটা, তোমার জীবনের অভিশাপ মনে ক'রেছিলে, সে-ই তোমার সকল অকল্যাণ সকল অমঙ্গল থেকে বাঁচাবার জন্যেই চিরদিনের মত তোমার পথ হ'তে স'রে গিয়েছে। মনে ক'রো, যাকে তুমি অনাদর ক'রেছ, তার এক কণা ভালবাসা পাবার জন্যে বহু হতভাগিনী বহু দিন ধ'রে সাধনা ক'রেছিল, কিন্তু সে কোন দিন তার মানসী-প্রিয়া তোমায় ছাড়া আর কারুর পানে একটু হেসেও চাইতে পারে নি; পাছে তোমার অভিমান হয়, পাছে তুমি ব্যথা পাও ভেবে।

আর একটা ছোট কথা এইখানে মনে প'ড়ে গেল। শুনে তুমি হয়তো আমায় কি ভাববে, জানি না।। তোমার বিরুদ্ধে যে-যে কারণে আজ এত বড় বুক-জোড়া অভিমান নিয়ে যাচ্ছি, এটাও তারই একটা। সেটা আর কিছু নয়, কাল চিঠিগুলো তোমার প'ড়তে প'ড়তে হঠাৎ ও-কথাটা মনে প'ড়ে গেল। তুমি জান, আমি বড্ডো হিংসুটে! তোমায় অন্যে ভালবাসবে, এ চিন্তাটাও সইতে পারিনে, দেখ্‌তে পারা তো দূরের কথা। সকলে তোমার খুব প্রশংসা করুক, তোমায় ভাল বলুক, তাতে খুবই আনন্দ আর গৌরব অনুভব ক'রব, কিন্তু তাই ব'লে অন্যকে তোমায় ভালবাস্‌তে তো দিতে পারি নে। আমি চাই, তুমি একা আমার—শুধু আমার—ভিতরে বাইরে পরিপূর্ণরূপে আমার হও, আর আমিও পূর্ণরূপে তোমার হাতে নিজেকে সমর্পণ ক'রে সুখী হই। আমি ছাড়া তোমাকে কেউ ভালবাস্‌তে পারবে না—কখনই না, কিছুতেই না।

তাই যখনই দেখেছি, যে, অন্যে তোমার দিকে একটু চেয়ে দেখেছে আর তুমিও তার পানে হেসে চেয়েছ, অমনি মনে হ'য়েছে এক্ষুণি গিয়ে তার বুকে ছোরা বসিয়ে দিই। কিন্তু খোদা তোমাকে রূপ আর গুণ এত অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে দিয়েছেন, যে, তোমায় দেখেই লোকে ভালবেসে ফেলে। ভালবাসা-পিয়াসী তৃষাতুর মানুষের মন তোমাকে যে ভাল না বেসেই পারে না! তাই কত দিন মনে হ'য়েছে, যে, তোমাকে নিয়ে এমন বিজন বনে পালাই, যেখানে তুমি আর আমি ছাড়া কেউ থাক্‌বে না! চোখ মেল্‌লেই আমি তোমাকে দেখব, তুমি আমাকে দেখ্‌বে। আমার এ যেন রাহুর প্রেম। নয়? আমায় ছেড়ে অন্যকে তুমি ভালবাসবে, আমার এই ব্যথাটাই সব চেয়ে মর্ম্মন্তুদ। তাই তো এমন ক'রে তোমার কাছে যাচ্ঞা ক'রে এসেছি, যে আমার চেয়ে বেশী ভাল কাউকে বাস্‌তে পারবে না—পারবে না! কিন্তু তুমি আমার অত সকরুণ মিনতি শুনেও কোন দিন কথা ক'য়ে তো জানাওইনি, একটু মিথ্যা ক'রে মাথা দুলিয়েও বল নি, যে হাঁ গো হাঁ! . . . শুধু নিস্তব্ধ মৌন হ'য়ে গেছ। তোমার তখনকার ভাবের মানেটা আজও বুঝতে পারছি নে ব'লেই আমার এত প্রাণ-পোড়ানী আর ছট্‌ফটানী। আজ আমি বড় সুখে ম'রতে পারতাম, যদি আমার এই চিরদিনের জন্যে ছাড়াছাড়ির ক্ষণেও জান্‌তে পারতাম তোমার সত্যিকার মনের কথা। এখন জানাতে চাইলেও হয়তো আর জানাতে পার্‌বে না। যদিই পার্‌তে, তা হ'লে হয়তো চির-হতভাগ্য ব'লে একটু করুণা ক'রে আমার অনেক কিছু সিক্ত সান্ত্বনা দিয়ে আমায় প্রবোধ দিতে, কিন্তু

হায় প্রিয় আমার, এ মৃত্যুপথের পথিককে আর ভুলাতে পারতে না, সে সুযোগ তাই আমি ইচ্ছা ক'রেই দিলাম না তোমায়। যখন তুমি আমার এই চিঠি প'ড়বে, তখন আমি তোমার নাগালের বাইরে গিয়ে প'ড়ব। দেখ, আমার আজ মনে হ'চ্ছে, পুরুষদের মতন বোকা ভ্যাবাকান্ত আর নেই, অন্তত: মেয়েদের কাছে। পুরুষ যেমন ক'রে ভালবাসা পাবার জন্যে হা-হা ক'রে উন্মাদের মতন ছুটে যায়, তা দেখে মনে হয়, এর এ বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা বুঝি স্বয়ং ভগবানও মেটাতে পার্‌বে না, কিন্তু তাকে একটী ছোট্ট মিষ্টি কথা দিয়ে তোমরা এমনই ভুলিয়ে দিতে পার, যে, তা দেখে অবাক্ মেরে যেতে হয়। এত বড় দুর্দ্দান্ত দুর্বিনীতকে ঐ একটু মিষ্টি ক'রে 'লক্ষ্মীটী' ব'লে একটু কপালে গিয়ে হাতটী রাখ্‌লে, বা গিয়ে তার হাতটী ধ'র্‌লেই সে যত-দূর-হ'তে-পারা-সম্ভব সুশীল সুবোধ বালকটীর মতন শান্ত হ'য়ে পড়ে! তোমার মনে কি আছে, তা ভেবে দেখ্‌তে চায় না, ঐ একটু পেয়েই ভালবাসার কাঙাল পুরুষ এত বেশী বিভোর হ'য়ে পড়ে! তবু তোমরা এই বেচারা হতভাগা পুরুষদের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ধরা দাও না। কিছুতেই তোমাদের মনের কথাটী পাওয়া যায় না,—সব ভালবাসাটুকু পাওয়ার আশা তো মরীচিকার পেছনে ছোটার মতই। কোথায় যেন তোমাদের মনের সীমা-রেখা, কোথায় যেন তোমাদের ভালবাসার তল, কোথায় যেন তার শেষ। আমি তাই অবাক্ হ'য়ে অনেক সময় ভাবি আর ভাবি! মনে ক'রো না, যে, এগুলো সকলেরই মনের ভাব। আমি আমার এখনকার মনের ভাবগুলো সোজাসুজি জানাচ্ছি। তোমার সঙ্গে তা না মিল্‌তেও পারে।

এমনি ক'রে পুরুষ নারীর কাছে চিরদিন প্রতারিত হ'য়ে আস্‌ছে। কারণ, তারা বাইরে যত বড় কর্ম্মী বিদ্বান আর বীর হোক্ না কেন, তোমাদের কাছে তারা একের নম্বর বোকা, একেবারে ভেড়া ব'নে যায় ব'ললেও অত্যুক্তি হয় না। তোমাদের কাছে থেকেও তোমাদের মন বুঝ্‌তে স্বয়ং ভগবান পার্‌বে না, এ আমি আজ জোর গলায় ব'লছি। তোমরা নারী, তোমাদের স্বভাবই হ'চ্ছে স্নেহ করা, সেবা করা, যে কেউ হোক্ না কেন, তার দুঃখ দেখ্‌লে তোমাদের প্রাণ কেঁদে ওঠে, একটু সেবা ক'রতে ইচ্ছে হয়। ওতে তোমাদের গভীর আত্মপ্রসাদ, নিবিড় তৃপ্তি। এইখানে তোমরা দেবী, সন্ন্যাসিনী। এই ব্যথিতের ব্যথা মুছাতে তোমরা সকল রকম ত্যাগ স্বীকার ক'রতে পার, কিন্তু তাই ব'লে সবাইকে ভালবাস্‌তেও পার না আর ভালবাসও না। এইখানেই পুরুষ সাংঘাতিক ভুল ক'রে বসে। তোমাদের ঐ সেবা আর করুণাটুকু সে ভালবাসা ব'লে ভুল ক'রে দেখে, অবশ্য যদি সে তোমায় ভালবেসে ফেলে। আর যাকে জান, যে, সে সত্তি-সত্যিই তোমাকে বড় প্রাণ দিয়েই ভালবাসে, অথচ তুমি কিছুতেই তাকে ভালবাস্‌তে পারছ না ; তা হ'লে তার জন্যেও তুমি সকল রকম বাইরের ত্যাগ স্বীকার ক'রতে পার, তার সেবা কর, শুশ্রূষা কর, তার ব্যথায় সান্ত্বনা দাও, কত চোখের জল ফেল করুণায়,—তবু কিন্তু ভালবাস্‌তে পার না। বাইরের সব সুখে জলাঞ্জলি দিতে পার তার জন্যে, কিন্তু মনের সিংহাসনে রাজা ক'রে কিছুতেই তাকে বসাতে পার না।

কিন্তু অন্ধ অবোধ পুরুষ তোমাদের ঐ স্বভাবজাত

করুণাকেই ভালবাসা মনে ক'রে বেশী আনন্দ পায়, সুখ অনুভব করে। হায় রে অভাগা! তাকে পরে তার জন্যে আবার দুঃখও পেতে হয় অনেক গুণ বেশী। কারণ—মিথ্যা যা, তা এক-দিন-না-এক-দিন ধরা পড়েই। হঠাৎ এক দিন নিশীথে বুকে জড়িয়ে ধ'রেও সে ধ'রে ফেলে, যে, আমার এই নিকটতম মানুষটী আমার সব চেয়ে সুদূরতম। আমার বুকে থেকেও এ আমার নয়। একে হারিয়েছি, হারিয়েছি এ-জনমের মত। সে যাতনা যে কি নিদারুণ, তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝ্‌বে না! এ ভুল-ভাঙার সাথে সাথে অনেকেরই বুক নিষ্করুণভাবে ভেঙে যায়, তার জীবন চিরতরে নিষ্ফল ব্যর্থ হ'য়ে যায়! সে তখন নির্ম্মম আক্রোশে নিজের ওপর নির্দ্দয়তম ব্যবহার ক'রে নিজের সে ভুলের শোধ নেয়! সে আত্মহত্যা করে, এক নিমেষে নয়, একটু একটু ক'রে ক'চ্‌লিয়ে ক'চ্‌লিয়ে।

তোমাদের নারী জাতিকে আমি খুব বেশী শ্রদ্ধা করি, প্রাণ হ'তে তাদের মঙ্গল কামনা করি, কিন্তু তাদের ওপর আমার এই অভিযোগ চিরদিন র'য়ে গেল, যে, তারা পুরুষের ভালবাসার বড় অনাদর করে, বড় অবহেলা অপমান করে! তারা নিজেও জীবনে সুখী হয় না, অন্যকেও সুখী ক'রতে পারে না। আমাদের সমাজের বেদনার সৃষ্টি এইখানেই। যে তাকে সকল রকমে সুখী ক'রে তার বাহির ভিতরে রাণী ক'রে দেবী ক'রে রাখতে পারত, রূপ-যৌবন-গরবিনী নারী তাকে পায়ে মাড়িয়ে চ'লে যায়। সে হতভাগার রক্ত-ঝরা প্রাণের ওপর দিয়ে হেঁটে পায়ে আল্‌তা পরে। পরে তাকে এর জন্যে অনুতাপ ক'রতে হয় সারাটা জীবন ধ'রে, তা জানি। ভালবাসাকে অবমাননা ক'রে

সে-ও জীবনে আর ভালবাসা পায় না, তখন তার জীবন বড় দুর্বিবসহ হ'য়ে পড়ে, বিষিয়ে ওঠে। তখন হয়তো তার বেশী ক'রে তাকেই মনে পড়ে, যে তার এক কণা ভালবাসা পেলে আজ তাকে মাথায় নিয়ে নাচ্‌ত। তোমরা হয়তো ভুরু কুঁচ্‌কে ব'লবে, এ আমার মিথ্যা ধারণা। তা বল, আমি যা' দেখছি, তাই ব'লছি! তোমরা একটা কথা ব'লবে,—নারী বড় ভালবাসার কাঙালিনী। একটু আদর পেলে তাকে সে প্রাণে মনে ভালবেসে ফেলে! . . .

শুনে হাসি পায় আমার! একটু আদর তো ছোট কথা, জন্ম জন্ম ধ'রে পাখীটার মতন ক'রে বুকে রেখে, আদর-সোহাগ ক'রে ভালবেসেও তোমার মন পাইনি, শুধু এই একটা উদাহরণ দেখিয়েই ক্ষান্ত হ'লুম। আমার মতন হতভাগা দু'-দশটা প্রায়ই দেখতে পাবে পথে ঘাটে টোঁ-টোঁ কোম্পানীর দলে! নেহাৎ চোখের মাথা না খেলে তোমরা তা অস্বীকার ক'রতে পারবে না।

যাক, আমি হিংসের কথা ব'লতে গিয়ে কি সব বাজে ব'কলুম। আমি ব'লতে চাই, যে, আমি তোমায় দেখিয়ে-দেখিয়ে তোমারই চোখের সাম্‌নে একে ওকে কত আদর ক'রেছি, কিন্তু কোন দিন তোমার তাতে হিংসে হয় নি। তুমি কোন দিন বাইরে ভিতরে এতটুকু চঞ্চল বা বিচলিত হও নি। তুমি মনে মনে জান, যে, তুমি আমার নও, তুমি আমায় ভালবাসতে পার না, অতএব আমি যাকেই যত আদর ভালবাসা দেখাই, তাতে তোমার

কিছুই আসে যায় না! আমার ওপর যখন তুমি কোন দাবীই রাখ না, তখন আমায় যে-কেহ ভালবাসুক বা আমি যাকেই ভালবাসি, তাতে তোমার কি আসে যায়?

আমার এখন মনে হ'চ্ছে কি, জান? আমি যদি তোমার চেয়েও সুন্দরী মেয়ে হ'তে পারতুম, তা হ'লে তোমার ভালবাসার মানুষটীকে ভালবেসে দেখাতুম, তোমার বুকে কেমন ব্যথা বাজে, কত বেদনা লাগে!

এত কথা কেন জানালুম, জান? আমি আজ রাজ-বন্দী. প্রেসিডেন্সী জেলের হাজতে ব'সে তোমায় এই চিঠি দিচ্ছি। কাল আমার বিচার হবে। বিচারে দু'টী বছরের সশ্রম কারাদণ্ড তো হবেই। জেলের এক কর্ম্মচারী দৈব-ক্রমে আমারই এক বন্ধু—শৈশব কালের। আমাদের আজ আশ্চর্য্য রকমের দেখা-শোনা। স্কুলে আমাদের দুই জনের মধ্যে বরাবর ক্লাশে ফার্ষ্ট্ কে হবে, এই নিয়ে জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চ'লতো। ওঁরই কৃপায় এত বড় চিঠি এমন ক'রে লেখবার অবসর আর সাজ-সরঞ্জাম পেয়েছি, তা না হ'লে কারুক্‌খে কোন কিছু জানিয়ে যেতে পারতুম না। ভগবান বন্ধুর আমার মঙ্গল করুন!

তুমি মনে ক'রবে, মাত্র দু'-বছরের জেল হবে হয়তো, তার জন্যে এমন বিদায়-কান্না কেন? আবার তো ফিরে আস্‌ব। কিন্তু আমি জানি, আমি আর ফির্‌ব না। তোমায় এত দিন বলি নি, লুকিয়ে রেখেছিলুম, কিন্তু আজ যাবার দিনে কষ্ট পাবে জেনেও জানিয়ে যাচ্ছি। আমার যক্ষ্মা হ'য়েছে—যাকে আমাদের দেশে শিবের অসাধ্য রোগ বলে। ডাক্তারে কতবার আমায় পরিশ্রম ক'রতে মানা ক'রেছে, আমার কত বন্ধু আমায় কত

মিনতি ক'রে হাতে-পায়ে ধ'রে এখন কিছু দিনের জন্যে বিশ্রাম ক'রতে ব'লেছে, আর আমি ততই দ্বিগুণ বেগে কাজ ক'রেছি। সে সময় তুমি যদি আমায় একটীবার মানা ক'রতে, করুণা ক'রে নয়, ভালবেসে! তা হ'লে কি ক'রতুম জানি না; কিন্তু তুমি তো আর আমার এ ভীষণ রোগের খবর জান্‌তে না! তা হ'লে দয়া ক'রে হয়তো আমায় মিনতি ক'রে লিখতে ভাল হবার জন্যে। . . .

তবু কিন্তু তোমার সকল শাসন মেনে চ'লছি আমি আমার শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত। এমন ক'রে আর কেউ আমায় কথা শোনাতে পারে নি, এ বিশ্বে এত বড় স্পর্দ্ধা তুমি ছাড়া আর কারুর হয় নি, যে, আমায় শাসন করে, হুকুম শোনায়!—যদি কোন অপরাধ ক'রে থাকি তোমার কাছে কোন দিন, তবে তা ভুলে যেও না, ক্ষমা ক'রো এই ভেবে, যে, তুমি যাকে কিছুতেই ভালবাস্‌তে পার নি, সে-ই তোমার সকল কথা তার শেষ দিন পর্য্যন্ত খোদার পবিত্র বাণীর চেয়েও পবিত্রতর মনে ক'রে মেনে চ'লেছে। এইটুকু ভেবে পার তো একটু আনন্দও অনুভব ক'রো। আমার মতন দুর্জ্জয় বাঁধন-হারাকে তুমি জয় ক'রেছিলে, এই ভেবেও একটু গৌরব ক'রো।

দু' বছর না হ'য়ে যদি মাত্র ছয় মাসেরও সশ্রম কারাদণ্ড হয় আমার, তা হ'লেও আমার ফিরবার কোন আশা নেই। যক্ষ্মায়